জুন ২০২৫

আখবারে তওহীদ

কুষ্টিয়া জনসভা: অতীতের শত্রু আজকের বন্ধু
পৃষ্ঠা > ১৯

একজন আনুগত্যশীল মোজাহেদের সাথে মাননীয় এমামের অন্তিম কথোপকথন
পৃষ্ঠা > ৪৬

কেমন ছিল সেদিনের নোয়াখালী?
পৃষ্ঠা > ১৩

ঝড় আল্লাহর, অনুষ্ঠানও আল্লাহর
পৃষ্ঠা > ১৭

কুষ্টিয়ায় হেযবুত তওহীদের বৃহত্তম জনসমাবেশ

সূচিপত্র

- *পাথেয় ৩*
- *মাননীয় এমামের উপলব্ধি: কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ ৪*
- *বিশেষ সাক্ষাৎকার: হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া ভাষণের রহস্য............................... ৫*
- *বড় বই-যা দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয় ৮*
- *৫ আগস্টের অভিজ্ঞতা: কেমন ছিল সেদিনের নোয়াখালী? ১৩*
- *অলৌকিক ঘটনা: "ঝড় আল্লাহর - অনুষ্ঠানও আল্লাহর" ১৭*
- *কুষ্টিয়া জনসভা: অতীতের শত্রু আজকের বন্ধু ১৯*
- *সংশপ্তক: ১৪০ কি.মি সাইকেল চালিয়ে মিটিংয়ে হাজির ২০*
- *ওমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস: এক তরুণ সাহাবীর ঈমানদীপ্ত শাহাদাৎ ২১*
- *উপলব্ধি: এই সময়কে মূল্যায়ন করা ... ২৩*
- *দেখা থেকে লেখা: ঢাকায় ঈদুল আজহার জামাতে একদিন ২৫*
- *মানতের ফল ২৭*
- *ঘাম ঝরানোর বিকল্প নেই ২৮*
- *সাহিত্যপাতা ৩০*
- *যার আহ্বানে দীন গ্রহণ করেছেন দুই হাজার নারী-পুরুষ ৩৩*
- *বালাগ পৌঁছাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪*
- *ভ্রমণকাহিনী: চাষীরহাট গ্রামে একদিন.. ৩৬*
- *হামলা/নির্যাতন ৩৭*
- *সাম্প্রতিক ৩৯*
- *সোশ্যাল মিডিয়ায় মাননীয় এমাম সম্পর্কে শুভাকাঙ্খীদের মন্তব্য ৪১*
- *স্বাস্থ্যপাতা ৪৪*
- *অকালে ঝড়ে যাওয়া প্রাণ ৪৫*
- *একজন আনুগত্যশীল মোজাহেদের সাথে মাননীয় এমামের অন্তিম কথোপকথন ... ৪৬*

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের উত্তরাধিকার আখবারে তওহীদ

আখবারে তওহীদ আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক গৌরবময় ইতিহাস। কীভাবে সেটা বলছি। 'আখবার' শব্দের অর্থ খবর, আর 'তওহীদ' মানে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজরা উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য বহু ষড়যন্ত্রমূলক নীতি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন কিছু গোঁড়ামি ছিল যা মুসলমানদেরকে পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। যেমন ওয়াহাবি চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত কিছু মানুষ মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা চাইত ইসলামী শরিয়াহ ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি যেন মুসলমানদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তারা এমন এক ফতোয়া প্রচার করতে থাকেন যা মুসলমানদের জন্য আত্মবিনাশী হয়ে ওঠে। তারা প্রচার করে দেন যে, ইংরেজি ভাষা শেখা মুসলমানদের জন্য হারাম, কারণ তা "কাফেরদের ভাষা"। অথচ সেই সময় সব স্কুল কলেজই ছিল ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আর সেখানে ইংরেজিই ছিল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। এই ফতোয়ার কারণে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রশাসনিক দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে যে জাতি ছিল শিক্ষকের জাতি, তারা হয়ে পড়ে অশিক্ষিত কৃষক জনগোষ্ঠী। অপরদিকে, হিন্দু সম্প্রদায় যুগের বাস্তবতা বুঝে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হয় এবং প্রশাসন ও সমাজের নেতৃত্বে জায়গা করে নেয়।

এই অধঃপতন থেকে মুসলমান সমাজকে উদ্ধারের জন্য কিছু মনীষী যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা উপলব্ধি করেন, মুসলিম জাতিকে জাগাতে হলে তার গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাই তারা একটি মুসলিম নবজাগরণের উদ্যোগ নেন। নবজাগরণের প্রধান উপাদান সাহিত্য। কিন্তু সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান ছিল না। কেবল কায়কোবাদ ও মীর মোশাররফ হোসেন ছাড়া আর কেউ দৃষ্টিগোচর হতেন না। এই প্রেক্ষাপটে করটিয়ার পন্নী পরিবার বাংলার মুসলিম নবজাগরণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা

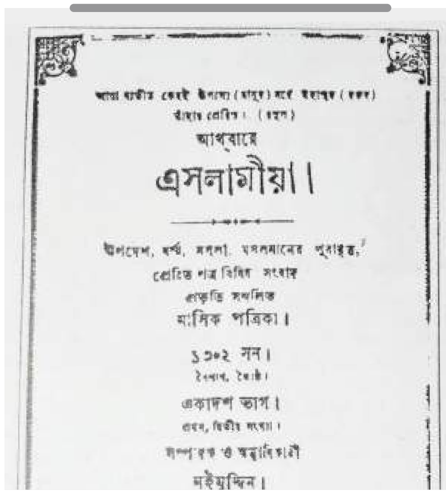

রাখে। মহামান্য এমামুয্যামানের দাদার দাদা করটিয়ার জমিদার সাদৎ খান পন্নী ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগী। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী, যিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন, তিনি ইসলামের বিভিন্ন শাখায় সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। সে যুগে যখন অধিকাংশ জমিদারবাড়িতে বাঈজিদের গান-বাজনার আসর বসতো, তখন পন্নী জমিদার বাড়িতে বসতো কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী বিদেশ থেকে একটি মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করে নিজ বাড়িতেই ছাপাখানা স্থাপন করেন, যার নাম দেন 'মাহমুদীয়া যন্ত্র'। এরপর তিনি টাঙ্গাইলের সুরুজ গ্রামের আলেম মৌলভী মোহাম্মদ নঈমউদ্দিনকে দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন- নাম আখবার-এ-এসলামিয়া (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ / ১২৯১ বঙ্গাব্দ), অর্থাৎ "ইসলামের খবর"। এটি ছিল টাঙ্গাইলের প্রথম পত্রিকা। এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম মৌলভী গোলাম সরওয়ার।

এই পত্রিকায় মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক দুর্দশা থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে লেখালেখি হতো। এটি হয়ে ওঠে ইসলামপ্রেমী সেই সকল মানুষের মুখপাত্র, যারা জাতীয় জীবনে ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে চায়, বাংলার মুসলমানদেরকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। ড. কাজী আব্দুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১/৮ ডিমাই সাইজের এই মাসিক পত্রিকাটি প্রায় দশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, করটিয়া থেকেই বাংলায় কোর'আনের প্রথম বঙ্গানুবাদ (২৩ পারা) প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক যা ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

অন্যদিকে, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষণায় আরেকটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো, নাম আহমদী। এই দুটো পত্রিকার মধ্যে ছিল সাপেনেউলে সম্পর্ক। আখবার-এ-এসলামিয়া যেখানে মুসলিম আত্মপরিচয় ও ইসলামী আদর্শের পক্ষে দাঁড়াত, সেখানে আহমদী ইংরেজদের মতবাদকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট ছিল। এই বিতর্ক এতদূর গড়ায় যে, মীর মোশাররফ হোসেনের লেখা একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে তা আদালত পর্যন্ত পৌঁছায়।

২০০৬ সনে যখন মহামান্য এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের খবরাখবর নিয়ে একটি বুলেটিন প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি ঐতিহাসিক আখবার-এসলামিয়ার কথা স্মরণ করে এর নাম দেন আখবারে তওহীদ। এভাবেই এক শতাব্দী পর ইসলামের নবজাগরণের প্রত্যাশা নিয়ে আরেকটি পত্রিকা জন্ম নেয় পন্নী পরিবারের এক উত্তরসূরির হাতে। যেদিন আখবারে তওহীদ হেযবুত তওহীদের আদর্শিক মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিনই এই পত্রিকার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার পূর্ণতা পাবে।

আল্লাহর বাণী

এই যে রসুলগণ, তাদের কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর আমি মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি ও রূহুল-কুদসের মাধ্যমে তার সাহায্য করেছি। (সুরা আল বাকারা- ২৫৩) আর তিনি তো কিয়ামতের নিদর্শন। অতএব, তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কোরো না এবং আমারই অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ (সুরা জুখরুফ: ৬১)। আর আহলে কিতাবের যত শ্রেণি রয়েছে, তারা সবাই (কিয়ামতের আগে) ঈসার ওপর ইমান আনবে, ঈসার মৃত্যুর আগে (সুরা নিসা- আয়াত ১৫৯)

রসুলাল্লাহর বাণী

আখেরি জামানায় তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র ঈসা অবতরণ করবেন। তিনি ইনসাফের সাথে বিচার করবেন, ক্রুশ ভেঙে দেবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া বাতিল করবেন। তখন সম্পদ এত বেশি হবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। (বুখারি, হাদিস : ২/৭৭৪) তারপর ঈসা (আ.) আসবেন। তিনি দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। এরপর মানুষ এমন এক শান্তিময় যুগে প্রবেশ করবে যখন কোনো হিংসা থাকবে না। (মুসলিম: ২৯৩৭)

এমামুয্যামানের বাণী

দাজ্জালকে প্রতিরোধ এবং ধ্বংস করলে যা সম্ভবই না সেই দুই শাহাদাতের সমান মর্যাদা। কোন শাহাদাত? বদর এবং উহুদের শাহাদাত। কতবড় সম্মান ও পুরষ্কার! চিন্তা করা যায়! চিন্তা করা যায় না। আমি তো বলি সমস্ত ইসলামে আর কোন কাজ নাই যেটাতে এত বড় সম্মান ও পুরষ্কার আছে। যেটা কিনা ইসলামে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরষ্কার। তার উপরে কিছু নাই কিছু। কাজেই এখন দাজ্জালকে প্রতিরোধ (Resist) করার এই যে সুযোগ, যে কাজটা করলে বদর এবং উহুদের শাহাদাতের মরতবা আপনারা পাবেন। তাই আমি বলি শুনেন, এই সুযোগ আল্লাহর রাসুলের (সা.) আসহাবরা পান নাই। কোন নবীর সাহাবারাও পান নাই, নবীরা পান নাই এবং এরপরে ঈসা (আ.) এসে দাজ্জালকে ধ্বংস করার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কেউ পাবেও না। কতবড় Scope (সুযোগ)! মাত্র কয়েকটা বছর। আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কত লক্ষ, কত হাজার বছর গেছে কে জানে? এর মধ্যে দাজ্জালের মাত্র কয়েকটা বছর। এর মধ্যে যারা জন্মাল ও দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Fight) করার সুযোগ পেল তাদের চেয়ে বড় সৌভাগ্যবান আর কেউ আছে? না। কি ভাগ্য আপনাদের, আপনারা পেয়েছেন!

এমামের বাণী

আপনাদের যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, তারা এই বাচ্চাদের রক্ষা করতে চাইলে হয় দ্রুত তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে যান। ক্যাঙ্গারু যেভাবে বাচ্চাদের পেটের থলের মধ্যে করে নিয়ে যায়, সেভাবে তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে কোথাও চলে যান। অথবা দ্রুত লড়াই করে এখানে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেন, দেশটাকে বাঁচান, নিজের বাচ্চাদের বাঁচান। যদি সেটা না করেন, আমি বলে রাখলাম চোখের সামনে আপনাদের বাচ্চারা মরবে, চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। গাজায় যা হয়েছে সেটা এখানে হবে। যদি ওদের বাঁচাতে চান পালান, অথবা দ্রুত নিজেদের সব জীবন সম্পদ যা কিছু আছে সব নিয়ে লড়াইতে নামেন। দীন প্রতিষ্ঠা করেন।

মাননীয় এমামের উপলব্ধি

কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বনী ইসরাইল জাতির দুর্দশা ও তা থেকে উদ্ধারের ঘটনাবলি যেমন বর্ণনা করেছেন, পাশাপাশি বনী ইসরাইলদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন। তারা ছিল অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য জাতি। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যখন মুসা স্বজাতিকে বললেন: তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সুরা ইব্রাহীম ৬-৭)।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আয়াতটি আমাদের জন্যও খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। এমামুয্যামান একটা কথা বলতেন, 'হেযবুত তওহীদের সঙ্গে এক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। তবে মনে রাখবা- আল্লাহই যথেষ্ট, হাসবুনাল্লাহ। অসীম সাগরের মধ্যে আমরা এক ফোটা পানির সমান। কিন্তু তিনি চাইলে এক ফোটা পানিকেও সমুদ্রে পরিণত করতে পারেন।' সকল প্রকারের ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে। দাজ্জাল আমাদের বিরুদ্ধে। তারা প্রকৃত ইসলামের উত্থান চায় না। তারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। অথচ সেই হেযবুত তওহীদ আন্দোলনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিরাপত্তা দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন।

পাঁচ আগস্টের পর সারা দেশে কী পরিমাণ তাণ্ডব ঘটে গেছে। বড় বড় রাজনৈতিক দল দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেছে। এমনকি যারা এক সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে নয়টি বছর দেশ শাসন করেছে, যাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার কেউ ছিল না, সেই জাতীয় পার্টির মত দলের কোনো হদিশ নেই। আওয়ামী লীগ তো দেশছাড়া হয়ে গেছে, অথচ তারা এই দেশকে বলা যায় জন্ম দিয়েছে। সেদিক থেকে হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কতটা নিরাপদে রেখেছেন! আমাদেরকে আল্লাহ এখন কাজ করার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বলেছি, 'আপনারা সব জায়গায় যান। আমাদের মেসেজটা পৌঁছে দেন।' যারাই গেছেন তারাই বিস্ময়কর সাড়া পেয়েছেন। গত একমাসের মধ্যে অনেক ডিসি-এসপি বলেছেন, 'আমরা আছি, আপনারা কাজ করেন। জনসম্পৃক্ততা বাড়ান।' আর মাঠে আছে সেনাবাহিনী। তাদের কাছে আমাদের যেসব টিম যাচ্ছে, তাদেরকে ক্যাম্প থেকে বলা হয়েছে, 'আপনাদের বিষয়ে আমরা ভালোভাবে জানি। আপনারা কাজ করেন। কোনো জায়গায় সমস্যা হলে জানাবেন।'

এই চলমান অরাজকতার মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন আমরা যদি এই নেয়ামতের শোকর গুজার না করি তাহলে সেটা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। শোকর গুজার করা মানে বসে বসে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়া না। আমি বলেছিলাম, আপনারা এই একটা বছর রাতদিন ২৪ ঘণ্টা মাঠে থাকেন। এই যে ছাত্র সমন্বয়করা যারা নতুন দল গঠন করেছে এনসিপি, তাদের ছেলেমেয়েরা আক্ষরিক অর্থেই মাঠে থাকে। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকেই তারা নানারকম আন্দোলন নিয়ে রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায়, রাস্তায় ঘুমায়। আমি তাদের রোজ দেখি মাঠে তারা কোনো না কোনো আন্দোলন বা কর্মসূচি পালন করছে। কারণ তারা জানে শেখ হাসিনা ফিরে আসলে তাদের অবস্থা খারাপ করে ফেলেবে। আজকে তারা মাঠে আছে বলেই কিন্তু তাদের কথায় সরকার চলে, দেশ চলে। কিন্তু হেযবুত তওহীদের মধ্যে এই পেরেশানি, এই দুশ্চিন্তা দেখি না।

ফেরাউনের নির্যাতন থেকে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করার পর তিনি মুসার (আ.) মাধ্যমে আবার সেই অবাধ্য জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি তারা এর হক আদায় না করে তাহলে তিনি তাদেরকে এর জন্য কঠোর শাস্তি দিবেন। আমিও বলছি, যদি আপনারা আল্লাহর দেওয়া এই সুযোগকে কাজে না লাগান, যদি সবার কাছে না যান, যদি ঘরে বসে থাকেন তাহলে আপনাদের উপরও আল্লাহর কঠোর শাস্তি নেমে আসবে। এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, এটা আল্লাহর সুন্নাহ। তাঁর সুন্নাতে কোনো পরিবর্তন নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। ময়দানে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম করার তওফিক দান করুন। আমিন।

হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া ভাষণের রহস্য

→ মাননীয় এমাম একজন বিরল প্রতিভার অধিকারী বক্তা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রোতাদেরকে আটকে রাখেন তার কথার জাদুতে। শ্রোতাদের হাসান, কাঁদান, অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু কীভাবে তিনি একজন বক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরি করলেন? কী আছে এর পেছনে? সে কথাই তিনি বলেছেন আখবারে তওহীদের সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে!

প্রশ্ন: আপনার বক্তব্য চর্চার শুরুটা কীভাবে?

উত্তর: আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমাকে ছাত্র শিবিরের কর্মীরা আলোচনা করার জন্য নিয়ে যেত। ওটা ছিল তাদের টার্গেট। কারণ আমার আব্বা এলাকার প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ছিলেন। যাহোক একাডেমিক ব্যাপারে আমি কখনো আমার ছোট ভাই জসিমকে ওভারটেক করতে পারিনি। জসিম এবং আমি মাঝেমধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতাম। যদিও ও আমার থেকে কয়েক ক্লাস জুনিয়র ছিল। কিন্তু সবসময় ফার্স্ট বয় ছিল। আমার ক্লাসে রোল নম্বর সবসময় তিন, চার বা পাঁচ থাকত। তো জসিম আর আমার মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করতে দিত। যে জিতত তাকে বই, কলম ইত্যাদি দেওয়া হত। তো কলেজে উঠার পর কুমিল্লা কলেজে একবার একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেখানে আমি বক্তব্যের মধ্যে কখনো আবেগপূর্ণ কথা, কখনো নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম। আমার এই বক্তব্য শুনে সবাই রীতিমত ইম্প্রেসড হয়ে গিয়েছিল। আমার এই নিজস্ব স্টাইলের কারণে আমি সবসময় এসব প্রতিযোগিতায় প্রথম-দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি। এই অবস্থান কেউ নিতে পারত না। কলেজে উঠার পর আমি পুরোদমে রাজনীতিতে চলে গেলাম। এরপর থেকে বক্তব্যের শিল্পগুণ, শালীনতা, আর্ট এগুলোর দিকে আর আমার নজর নাই। আমি পুরোপুরি ঢুকে গেলাম রাজনীতির মাঠে। মাইকের প্রচণ্ড শব্দ, মুহূর্মুহু করতালি, স্লোগানে-স্লোগানে আর মিছিলে-মিছিলে আমি ডুবে যেতে লাগলাম। তখন আমি ভাবলাম আমাকে এমন কিছু বলতে হবে যাতে মানুষের মনে উত্তেজনা তৈরি হয়। একাডেমিক কথা বলার কোন সুযোগ নেই। তখন থেকেই মূলত আমার বক্তব্য দেয়া শুরু। এরপর যখন আমার রেজাল্ট হলো তখন আমি বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হলরুমসহ বিভিন্ন মহলের উদ্দেশ্যে নানাভাবে

বক্তব্য রেখেছি। আমাদের এলাকায় বিভিন্ন মাহফিলে বক্তব্য দিয়েছি। এই সময় কিছুটা গুছিয়ে ভাব গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলা শুরু করি।

কিন্তু হেযবুত তওহীদে আসার পর আমার বক্তব্যের বিষয় চেঞ্জ হয়ে যায়। এমামুয্যামানের সামনে যখন যেতাম তিনি আমাকে কথা বলতে বলতেন। বলতেন আলোচনা শুরু করো। আমি কথা বলতাম, এমামুয্যামান বসে বসে সেটা শুনতেন। আমি ধীরে ধীরে তখন বুঝতে পারলাম বক্তব্যের মধ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আর এটার একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে। আমি যা বলব তা নিজের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং কাজে প্রমাণ করতে হবে। এমামুয্যামানের সামনে এসে এই ধারণা পাই। কোনো তথ্য ভুল বলা যাবে না, কোন গোঁজামিল দেয়া যাবে না। আবেগের বশে কোনো কথা বলা যাবে না, তখন আমার মধ্যে পরিবর্তন আসল। আমি বুঝলাম যে, আমাকে পড়ালেখা করে বক্তব্য দিতে হবে। এরপর থেকে মনযোগ দিয়ে পড়া শুরু করলাম। আমাকে যে বক্তব্য দিতে হবে সেটা কোনো সধারণ কথা না। আমি শ্রোতাকে কী বলতে চাই, কী বোঝাতে চাই এটাই হলো মূল। ধরুন, আমি আপনাকে 'গরু' কি জিনিস বুঝাতে চাইলাম। এটা বুঝানোর জন্য আমি নানা যুক্তি, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমি ব্যাখ্যা করলাম যে এটা কীভাবে একটা গরু। এখন আমার সমস্ত কথা শোনার পর আপনি যদি বুঝেন যে, এটা একটা গরু, তাহলে আমার বক্তব্য স্বার্থক হবে। কিন্তু আমি দুই ঘণ্টা কথা বলার পরও যদি আপনি বলেন, 'আমি কিছুই বুঝলাম না' তাহলে আমার বক্তব্য ব্যর্থ। তাই আগে বক্তাকে ঠিক করতে হবে যে তিনি শ্রোতাদের কী বোঝাতে চান।

> *প্রশ্ন: আপনি যখন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তখন একভাবে কথা বলেন আবার যখন মাহফিলে কথা বলেন তখন আরেক স্টাইলে কথা বলেন। এই ভাষার চয়েজটা কিসের উপর নির্ভর করে?*

উত্তর: আমি যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলব তখন অবশ্যই আমার পরিভাষাগুলো চেঞ্জ হবে। তখন তাদের বোঝার মত করে আমাকে বলতে হবে। আবার আমি যখন কৃষকের সামনে কথা বলব তখন আমার কথা বা উদারহরণগুলো হবে কৃষকের বোঝার মতো যেন তারা বুঝতে পারেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সামনে দেওয়া উদাহরণ দিলে হবে না। সময়, স্থান, কাল, পাত্র বুঝে বক্তাকে তার বক্তব্যের ভাষা পছন্দ করতে হবে।

> *প্রশ্ন: মহামান্য এমামুয্যামান আর আপনার বক্তব্যের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়?*

উত্তর: এমামুয্যামান মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মত বক্তা ছিলেন। উনি ভালো বক্তব্য দিতেন। এমামুয্যামানের সাথে আমার বক্তব্যে মৌলিক পার্থক্য হলো- আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর সাবজেক্টের অবতারণা করি। এমামুয্যামান এটা করতেন না। তিনি এক-দুইটি বিষয়ের ওপর ফোকাস করতেন। কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর বিষয়ের অবতারণা হয়- এটা একটা বিরাট সমস্যা। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, আমি খুব ফার্স্ট কথা বলি আর এমামুয্যামান স্লো কথা বলতেন। খুব ধীরে ধীরে কথা বলতেন। আসলে আমি যা কিছু বলি তার ভিত্তি তো এমামুয্যামানের কথাই।

> *প্রশ্ন: আপনার বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা শুনেন, বিভিন্ন মন্তব্যও করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?*

উত্তর: আমার একটা আত্মবিশ্বাস আছে যে, আমি টানা দশ ঘণ্টাও যদি কথা বলি সেটা কারো কাছে খারাপ লাগবে না। আমি মনে করি, মহাসত্য কোনো মানুষ ডিনাই করতে পারে না। তবে অহংকারীদের কথা ভিন্ন। আর কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না কারণ এটি মহাসত্য।

> *প্রশ্ন: আপনি মাঝেমধ্যেই বলেন যে, আপনাকে বলতে দেয়া হচ্ছে না। আপনার বিরুদ্ধে সারাদেশে শত শত ওয়াজ হয়েছে। আপনি বলেন, ছয় মাসের অনাবৃষ্টির ধূলাবালি আবর্জনা চলে যাবে দুই মিনিটের বৃষ্টিতে। আপনি এই কনফিডেন্স কীভাবে পেলেন?*

উত্তর: আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা ধর্মব্যবসায়ীরা করে, যে সমস্ত পয়েন্টে তারা কথা বলে তা অত্যন্ত মামুলি, ব্রেইনলেস, ঠুনকো, যুক্তিহীন। তাদের মোকাবেলায় আমার বক্তব্য মহাসত্য, সনাতন, অখণ্ডনীয়। সেগুলোকে তারা খণ্ডন করতে পারবে না। এজন্য তাদের ছয় মাসের অপপ্রচারের বিপরীতে আমার এক ঘণ্টার একটা বক্তব্যই যথেষ্ট। তবে হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে যারা এখন বক্তব্যগুলো দিচ্ছেন তাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের অনেক বক্তারা ভারসাম্য রাখতে পারেন না। যাদের উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য দেয়ার কথা, তাদের কথা শুনে মোজাহেদরা আস্তে আস্তে ডিমোরালাইজড হয়ে যায়, হতাশা দেখা যায়। বক্তার উচিত হচ্ছে, উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, মরাকে জীবিত করা, চেতনাহীন মানুষকে চেতনা দেয়া। ধরুন, আপনি একজন রোগীকে এমন একটি ওষুধ দিলেন, যার ফলে সে মারা

গেল, তাহলে তো সেটা চিকিৎসা হলো না। আপনি রোগীকে আঘাত করতে পারেন, ঝাঁকুনি দিতে পারেন, ধাক্কা দিতে পারেন কিন্তু উদ্দেশ্য হলো রোগীকে জীবিত রাখা। তাকে মেরে ফেলতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বক্তার সমস্যা হচ্ছে, তারা কথা শুরু করতে পারেন কিন্তু শেষ করতে পারেন না, অসমাপ্তভাবেই বক্তব্য গুটিয়ে ফেলতে হয়। শুরুতেই আমরা কাউকে বলতে পারি না যে ঈমান আনতে হবে। তথ্য-উপাত্ত, রেফারেন্স, আদ্যোপান্ত, আবেগ-অনুভূতি সমস্ত কিছু দিয়ে যখন বক্তব্য তুলে ধরা হবে তখন তারা এমনিই ঈমান আনতে বাধ্য হবে। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের ফলো করতে হয়। শ্রোতারা কোন প্রকৃতির, তারা আমার কথা রিসিভ করতে পারছে কি না বুঝতে হয়। আমি যদি পাঁচ হাজার লোকের সামনেও বক্তব্য দেই, যদি অডিয়েন্সকে কোন প্রশ্ন করার পর একজন ব্যক্তিও উল্টা উত্তর দেয় আমি তা বুঝতে পারব। এভাবেই মূলত বক্তাকে শ্রোতার মনোসংযোগ ধরে রাখতে হয়।

> *প্রশ্ন: মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, মানুষ একটানা বড় জোর ৪৫মিনিট ফোকাস রাখতে পারে। সেখানে আপনি ছয়-সাত ঘণ্টা সেমিনারে মানুষকে কীভাবে ফোকাসে রাখেন?*

উত্তর: এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি মনে করি, এই ব্যাপারটা আমার না, কয়েক ঘণ্টা ধরে এই ফোকাস ধরে রাখাটা আল্লাহর একটা কাজ। যদিও এজন্য আমাকে একটু কৌশলী হতে হয়। আমি যখন আলোচনা শুরু করি তখন আমাকে ধরেই নিতে হয় যে আমার সামনে বসে যারা আলোচনা শুনছেন তারা হচ্ছে শিশু। ধরুন, তাদের আমি একটা নতুন নগরী দেখতে নিয়ে যাব। আমি জানি তারা বেশিক্ষণ একটা বস্তুতে আটকে থাকবে না। কিছুক্ষণ পর পর বিক্ষিপ্ত হবে, বিরক্তি সৃষ্টি হবে। এজন্য তাদের এমনভাবে সবকিছু দেখাতে হবে যেন কোনকিছুতে বিরক্তি সৃষ্টি হওয়ার আগেই নতুন কিছু দেখতে পায়। তাকে বলতে হবে, ঠিক আছে এটা দেখাচ্ছি, ঠিক তারপরই বলতে হবে চল আরেকটা জিনিস দেখাই। অর্থাৎ তার মনোযোগ সরার আগেই আমি তাকে খুব দ্রুত রিলেটিভ সাবজেক্টের ভিতর ঢুকিয়ে দেই। ধরুন, কোন একটি সভায় আমি কেতালের আলোচনা করছি। কিছু পরিসংখ্যান ও তথ্য বুঝিয়ে দিচ্ছি। হাদিস নিয়ে একটু আলোচনা করছি। তারপর যুদ্ধের আয়াত নিয়ে আরও বিস্তারিত বলছি। পাশাপাশি সাহাবিদের শাহাদাতের মর্মান্তিক ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা শুরু করছি। শহীদ হবার আগে কী বলেছে, মায়ের সাথে কী কথা হয়েছে, ছেলের সাথে কী কথা বলছে ইত্যাদি নানা হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা করছি। এরপর হঠাৎ করেই আমি এরমধ্যে হেযবুত তওহীদের কোন একটা ঘটনা নিয়ে আসলাম। মূল জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম। অর্থাৎ আমি তাদেরকে এখান থেকে আস্তে আস্তে আমার আসল কথার দিকেই নিয়ে আসলাম। এভাবে আমি তাদের ফোকাসও ধরে রাখলাম আবার পুরো বিষয়টাও ভালোভাবে বোঝাতে পারলাম।

> *প্রশ্ন : আপনার সামনে বিভিন্ন সময়ে এমন অনেক ব্যক্তি আসে যারা উচ্চশিক্ষিত। আমরা দেখেছি, কলিমুল্লাহ স্যার, মুনতাসির মামুন, এমনকি প্রধান বিচারপতিও এসেছেন। এই যে অনেক উঁচু লেভেলের লোক যখন আসে তখন স্টেজ ফ্রাইট বা মঞ্চ ভীতি হয় না?*

উত্তর: না, হয় না। আমি জানি যে, আমি এমন এমন পয়েন্টে কথা বলব উনারা আমার কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তাদেরকে আমার বোঝাতে হয় যে আমি তাদেরকে এপ্রিশিয়েট করছি, সম্মান করছি, নিজেকে সুপিরিয়র মনে করছি না। জ্ঞান এমন একটা জিনিস যা সবার ঊর্ধ্বে। আমি তাদের জ্ঞানের সম্মান করছি। যাদের নাম বলা হচ্ছে তারা তো একালের জ্ঞানী কিন্তু হাজার বছর কালের জ্ঞানীরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছেন। এই গাছটার লক্ষ বছর পুরানো। আমাকে শুধু এইটুকু খেয়াল রাখতে হয় যে, আমি তাদের কিছু শেখাচ্ছি না বরং মনে করিয়ে দিচ্ছি। তারা সবই জানেন। তাদেরকে সেটা মনে করিয়ে দেয়াই আমার কাজ। যখন বলি, আজ আপনি আমার বিচারক, আপনি রায় দিবেন। যদি আমার কথায় মনোযোগী না হন তাহলে তো রায় দিতে পারবেন না। এভাবে আমি কথাটা অন্যভাবে থ্রো করি। এতে তারা অমনোযোগী হতে পারে না।

> *প্রশ্ন: শ্রোতারা অনেক সময় নিষ্প্রাণ থাকে, সেভাবে রেসপন্স করে না। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কীভাবে বক্তাকে সাহায্য করা যায়?*

উত্তর: শ্রোতারা ভালো ভালো প্রশ্ন করতে পারে। বুদ্ধিভিত্তিক প্রশ্ন করতে পারে। এভাবে বক্তাকে সহযোগিতা করতে পারে। প্রশ্নের ভিতরেই থাকবে তথ্য।

> *প্রশ্ন: আপনার প্রিয় বক্তার নাম কী? বাংলাদেশের ভিতরে এমন কে আছে? বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য কেমন?*

উত্তর: ভদ্রলোকের কথার মাঝে আর্ট আছে, কারিশমা আছে। উনি সত্যিকার অর্থে একজন বিপ্লবী। উনি নিজের স্টাইলে কথা বলতেন। এই যে উনার যে কথাটা

'আমরা বলেছি, পার্লামেন্টে একজন লোকও যদি সত্য কথা বলে আমরা তার কথা শুনব'। এটা আসলে একটা মারাত্মক কথা, যদিও গণতন্ত্রে এসব কথা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। উনি আসলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানিরা জুলুম করছে। অনর্থক আক্রোশে না, যুক্তি দিয়ে দিয়ে জনগণের সামনে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তারা কী করছে বাঙালিদের উপর।

প্রশ্ন: আপনি কথা বলার সময় মাঝে মাঝেই চোখ বন্ধ করে কথা বলেন। এই ব্যাপারটা আসলে কি?

উত্তর: আমার চোখ বন্ধ করার বিষয়টি আসলে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা বলতে শুধু অলৌকিকতা নয়, আধ্যাত্মিকতা মানে হলো মনোসংযোগ। আল্লাহর কথার সাথে আমার আত্মার একটা সংযোগ। আমি যখন দেখি জটিল কিছু তাত্ত্বিক বিষয়, একটা শব্দও উল্টা পাল্টা বলা যাবে না। তখন এই বস্তু জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে, একাগ্রতা বিনষ্ট হতে পারে। একটা শব্দও মিসটেক হয়ে যেতে পারে। তাই তখন আমি চোখ বন্ধ করে কথা বলি। নয়তো কথার ফ্লো কেটে যেতে পারে। এজন্যই আমি মূলত কখনো কখনো চোখ বন্ধ করে কথা বলি। আমি যদি কখনো এক ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে কথা বলি তাহলে দেখবেন সেই কথার শব্দগুলো হবে ভিন্ন, আলাদা। তখন কথার লাইনগুলি হবে ভারী। আমি যদি পরকাল নিয়ে কখনো চোখ বন্ধ করে কথা বলি দেখবেন আমার সেই আলোচনা বই থেকে বলা পরকালের আলোচনা হবে না। মনে হবে যেন আমি সামনে থেকে সেটা দেখছি। আমি যখন চোখ বন্ধ করে উহুদের যুদ্ধ নিয়ে কথা বলি তখন এমনভাবে বলি যেন আমি তখন মাঠে আছি। রসুলুল্লাহর (সা.) পলিসি নিয়ে যখন কথা বলি তখন এমনভাবে বলি যেন আমি ওই পলিসির মধ্যে ছিলাম। এই হচ্ছে চোখ বন্ধ করে কথা বলার মূল বিষয়টা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: আদিবা ইসলাম

বড় বই-যা দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয়

রিয়াদুল হাসান

১৯৯৯ সালের ঘটনা। আমি তখন আন্দোলনে নতুন নতুন আসা যাওয়া করছি। মহামান্য এমামুয্যামানের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় হয়েছে বটে, কিন্তু সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাঁকে 'এমামুয্যামান' বলে ডাকাও শুরু হয়নি। একেকজন একেকভাবে উনাকে সম্বোধন করত। কেউ বলত মামা, কেউ বলত ভাইয়া, কেউ বলত হুজুর, কেউ বা দাদু বলে ডাকতো। আমি ডাকতাম 'স্যার' বলে। প্রথম দিকে যেমন হয় অনেকের, আমারও

তেমনই হয়েছিল। সুযোগ পেলেই জ্ঞান ফলানোর চেষ্টা করতাম, জটিল জটিল প্রশ্ন করতাম। একদিন এমনই কিছু হয়তো বলেছিলাম, আজ আর মনে নেই, এমামুয্যামান বললেন, 'আমার বই পড়েছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পড়েছি কয়েকটা। আকিদা পড়েছি, যুগসন্ধিক্ষণে আমরা পড়েছি, কর্মসূচি পড়েছি'। সে সময় এগুলো আলাদা আলাদা বই ছিল। পরে 'ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা' নামে একসাথে বের হয়।

এমামুয্যামান বললেন, 'আরে মিয়া ওগুলা না। আমার মেইন বইটা পড়ছ কিনা।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না উনি কী বুঝাচ্ছেন। তখন অন্যরা বলল যে 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' পড়েছি কিনা সেটা এমামুয্যামান জানতে চাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'ও, আমি ওটার প্রথম দুই তিনটা চ্যাপ্টার পড়েছি।' এটা শুনে তিনি কিঞ্চিত রাগতস্বরে বললেন, 'আগে ঐটা শেষ পর্যন্ত পড়ো। তারপর প্রশ্ন করতে আইসো। আমি সব ঐটার মধ্যে লিখে দিসি।'

আমি হেযবুত তওহীদে আসার আগে ধর্ম সম্পর্কে একরকম সংশয়বাদী ছিলাম। বিজ্ঞানমনস্কতার নামে একপ্রকার ধর্মহীনতার ভাব আমাকে দখল করে নিয়েছিল। বড় বই যখন আমার হাতে আসে, আমি তখনই পড়তে লেগে যাই, কারণ নাম দেখে আমি ভেবেছিলাম এটা ইসলামবিরোধী কোনো বই হবে। পরে তো দেখলাম অন্য বিষয়। সিদ্ধান্ত সূত্র চ্যাপ্টারটা পড়ার পর খুব সামান্য ও প্রচলিত একটা যুক্তি- ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকবে এই কথাটা আমাকে নাস্তিকতার জগৎ থেকে বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমি বইয়ের ঐ পর্যন্ত পড়ার পর মানুষের সৃষ্টি নিয়ে ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর ঘোলাজল আমার চিন্তার মধ্যে স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেয়। মানুষের অরিজিনটা যখন ক্লিয়ার হয়ে গেল, তখন আর কোনো প্রশ্ন রইল না। আমার ঈমান আসলো যে এই বইয়ে যা আছে তার সবই সত্য। 'এই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন এবং তিনি একটি উদ্দেশ্য দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন'- এই মহাসত্য দুইটা হজম করতে আমার বহু সময় লেগে গিয়েছিল। তাই বড় বইয়ের বাকি অংশ আর পড়া হয় নাই। এমামুয্যামানের ধমক খেয়ে আবার সেটা পড়তে শুরু করি। করটিয়ায় যারা আমাদেরকে হেযবুত তওহীদ বোঝাতেন তারা বড় বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু এই বই যে গোটা বিশ্বের ইসলাম সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দেওয়ার বৈপ্লবিক সূত্র সেটা বোঝার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি। যতই পড়তাম মনে হতো মার্কসের ক্যাপিটাল, মাও সেতুং এর লাল বইয়ের মত বিশ্বকে পাল্টে দেওয়া বইয়ের তালিকায় যুক্ত হবে এ ইসলাম ইসলামই নয়। এই বই পড়ার পর কোর'আন বোঝা আমার জন্য সহজ হয়ে গেল, যে কোর'আনের অনুবাদ স্কুলজীবনে বহুবার পড়তে গিয়েও এগুতে পারিনি, সেই কোর'আন জীবিত হয়ে আমার সামনে ধরা দিতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম কেন তিনি 'আমার বই' বলতে এই একটি মাত্র বইকেই বোঝাতেন।

এ বইটি লেখার কারণ তিনি বইয়ের শেষ দিকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে শৈশব থেকেই তাঁকে একটি প্রশ্ন তাড়া করে ফিরত, যে মুসলিম জাতি এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল, কোন শুভঙ্করের ফাঁকিতে পড়ে তার আজ এই করুণ দুর্দশা? তিনি সমগ্র জীবন ধরে একটু একটু করে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছেন। কখনও চিন্তা করে, কখনও চিন্তা না করে তিনি এই দীনের একেকটি বড় বড় সত্যের উপলব্ধি লাভ করেছেন। এই জ্ঞান কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, নাকি এগুলো তাঁর চিন্তার ফসল- এটা নিয়ে তাঁর মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এভাবেই আজ এখানে একটি বইয়ের মধ্যে একটু, কাল একটি পত্রিকার পাতায় একটু- এমন করে জীবনের একটা পরিণত বয়সে এসে যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, তখন ইসলামের একটি গোটা চিত্র তাঁর সামনে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন, এই জ্ঞান তাঁর নিজের জ্ঞান নয়। এটা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে, এটা অর্পিত জ্ঞান। তিনি আঁৎকে উঠলেন, আল্লাহর কাছে করজোড়ে মাফ চাইতে লাগলেন, হে আল্লাহ আমি এক গোনাহগার। আমাকে কেন এই মহামূল্যবান ইসলাম যেটা পৃথিবীর কোথাও নাই, সেই জ্ঞান আমাকে কেন দিচ্ছ? আমি যদি এই কথা মানুষকে বলতে যাই, মানুষ তো আমাকে মেরেই ফেলবে। এই তওহীদের দিকে মানুষকে ডাকা, তারপর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে সমগ্র দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করার মত বিরাট কাজ তো নবী-রসুলদের কাজ। আমার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না। আমি বরং একটা বই লিখে এটা মানুষকে জানিয়ে দেই। তাহলেই আমি পরকালে বলতে পারব, আমি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি। এর বেশি করা আমার কর্ম না। এই চিন্তা থেকেই তিনি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসে বই লেখায় হাত দিলেন।

→ জ্ঞান ও বইয়ের রাজ্যে এমামুয্যামানের ছিল অবাধ বিচরণ, বই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, সত্যিকারের বন্ধু। ছোট বেলা থেকে নিয়মিত নিউজপেপার ও ম্যাগাজিন পড়া ছিল তাঁর অভ্যাস। দেশবিদেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাজার হাজার বই তিনি সংগ্রহ করেছেন। সেসব অনেক বই বাসায় এখনও সযত্নে রাখা আছে। তিনি বইয়ের জগতে ডুব দিলেন। তিনি যখন বই লেখার জন্য গবেষণায় নামলেন প্রতি পদে পদে আল্লাহর সাহায্য ও উপস্থিতি তিনি অনুভব করতে লাগলেন।

আল্লাহ যেন নিজ হাতে তাঁকে তথ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, দলিল দিয়ে লেখার উপাদান যুগিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোনো ভুল করতে দিচ্ছেন না, ভুল করতে গেলে অনেক সময় এমনভাবে সেটা শুধরে দিতেন যে মনে হতো এ এক অলৌকিক কাণ্ড। তিনি সকালে উঠেই চেম্বারে চলে যেতেন রোগী দেখতে। আর বাসায় ফিরে যৎসামান্য বিশ্রামের পরই ঢুকে পড়তেন লেখার ঘরে। পরিবারকে বিশেষ একটা সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি ছেলেমেয়েদেরকে দিয়েও তিনি কখনও কখনও বই ডিকশনারি ঘাটাঘাটি করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ করিয়েছেন। সন্তানেরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কলেজ পেরিয়ে ভার্সিটিতে পা রেখেছেন, এমামুয্যামানের তখনও বই লেখা চলছে। একটানা সতেরো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি লিখলেন তাঁর অতুলনীয় বই- এ ইসলাম ইসলামই নয়। কিন্তু প্রকাশ করতে আরো কিছু দিন বাকি।

সতেরো বছর ধরে তিনি তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো শেয়ার করে গেছেন নিয়মিতভাবে। ফলে অনেকেই তাঁকে বলত যে, এই মহাসত্য তো মানুষকে জানাতেই হবে। বই তো সবাই পড়বে না। এজন্য একটি সংগঠন করতে হবে। এমামুয্যামান সায় দিলেন। বললেন, 'সংগঠন করো কিন্তু আমি চালাতে পারব না। তোমাদেরকেই চালাতে হবে।' এভাবে ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর দাউদ মহলে একটি সুধী সমাবেশের আয়োজন করে তাতে এমামুয্যামান একটি বক্তৃতা করলেন। এভাবে হেযবুত তওহীদের যাত্রা শুরু হলো। এমামুয্যামানকে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রাখা হলো, কিন্তু এর প্রধান হিসাবে থাকলেন মওলানা ইব্রাহীম নামে এক ব্যক্তি। এমামুয্যামান যে বক্তৃতাটি দিলেন সেটা 'যুগসন্ধিক্ষণে আমরা' নামে প্রকাশ করা হলো। তখন বইটি বিনামূল্যেই বিতরণ করা হতো। এর পাঁচ মাস পর ১৯৯৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হেযবুত তওহীদের দায়িত্ব এমামুয্যামান নিজে গ্রহণ করেন।

হেযবুত তওহীদ গঠনেরও এক বছর পর ১৯৯৬ সালে 'এ ইসলাম ইসলাম-ই নয়' বইটির পাণ্ডুলিপি তিনি ইসলামি লেখক আসাদ বিন হাফিজকে দিলেন তাঁর পরিচালিত প্রীতি প্রকাশন থেকে সেটা বের করার জন্য। একটা বড় জমি তিনি বিক্রি করে দিলেন ছাপানোর খরচ বহন করার জন্য। পাণ্ডুলিপি পড়ে আসাদ বিন হাফিজ তো মুগ্ধ। কিন্তু বইয়ের নাম কী হবে এটা তখনও ঠিক হয়নি। এমামুয্যামান বললেন, 'আপনি একটা নাম চিন্তা করেন। আপনি তো পড়েছেন।' এছাড়াও তিনি ইমামুদ্দীন মোহাম্মদ তোয়াহা বিন হাবিবের কাছেও বইয়ের নামের বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। এই ভদ্রলোক আল্লাহর দয়ায় এখনও জীবিত আছেন। এমামুয্যামান তাঁকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে, প্রকৃত আলেম হিসাবে সম্মান করতেন। দীনের অনেক বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা পরামর্শ করতেন, এমনকি কোনো তথ্য সম্পর্কে জানার থাকলে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন। পাণ্ডুলিপি টাইপ করার পর প্রেস থেকে একজনকে প্রুফ দেখার জন্য দেওয়া হলো। ভদ্রলোক একজন প্রফেশনাল প্রুফ রিডার। কিন্তু বইয়ের কয়েকটা অধ্যায় পড়েই তিনি এসে বই ফেরত দিয়ে গেলেন। তিনি প্রুফ দেখতে পারবেন না। 'কারণ কী'- এমামুয্যামান জানতে চাইলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'এই বই পড়লে আমার ঈমান থাকবে না। তাই এটার প্রুফ আমার পক্ষে দেখা সম্ভব না। আপনি অন্য কাউকে দেন।' এমামুয্যামান বললেন, 'আপনার তো বইয়ে কী লিখেছি সেটা নিয়ে ভাবার দরকার নাই, আপনি বানান-টানান ঠিক করে দিবেন।' কিন্তু এতেও তিনি রাজি না, তিনি এই বই পড়বেনই না, কারণ এটা পড়ে অলরেডি তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা এমামুয্যামান নিজেই বইয়ের প্রুফ দেখতে লাগলেন।

প্রুফ হওয়ার পর বইয়ের সব ফর্মা ছাপা হয়ে গেল, বাকি রইল শুধু প্রথম ফর্মা। কারণ বইয়ের নাম তখনও দেওয়া হয়নি। এমন সময় আসাদ বিন হাফিজ ফোন করে এমামুয্যামানকে চাপ দিতে থাকলেন নামের জন্য। ফোন কলে থাকা অবস্থাতেই এমামুয্যামান বলে দিলেন, আচ্ছা, বইয়ের নাম দিয়ে দেন- এ ইসলাম ইসলামই নয়। নাম শুনেই প্রকাশক হৈ হৈ করে উঠলেন, 'আরে এটাই তো নাম। একদম

যুৎসই নাম- এ ইসলাম ইসলামই নয়।' এমামুয্যামান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। কারণ হাজারো চিন্তা করে বিশ বছর ধরে যে বইয়ের নাম করা যায়নি, সেটার নাম আল্লাহ এভাবে দিয়ে দিলেন। এমামুয্যামান যখন বইটি লিখছিলেন, তখনই তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এই বই বের হলে ধর্মব্যবসায়ীরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে। যার ফলে বইয়ের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করাও হতে পারে। তাই তিনি বইয়ের নাম কেবল প্রথম ফর্মাতেই রেখেছিলেন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় রাখেন নি।

বই বের হওয়ার পর এবার এমামুয্যামান এটা প্রচারের উদ্যোগ নিলেন। তিনি দেশের সকল স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা সংগ্রহ করলেন। তারপর ডাকযোগে এক কপি করে বই সবগুলো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলেন। এই বই হাতে পেয়ে সব স্কুল কলেজের শিক্ষকরা নড়ে চড়ে বসলেন। অনেক স্কুলের শিক্ষকরাই পর্যায়ক্রমে বইটি পড়লেন। অনেকেই তাদের মূল্যবান মতামত এমামুয্যামানকে চিঠি লিখে পাঠালেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের অনলাইন বুকলিস্টে এ ইসলাম ইসলামই নয় বইয়ের নাম এন্ট্রি রয়েছে।

→ এরপর তিনি যা ভেবেছিলেন সেটাই হলো। মোল্লা-মৌলভীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হল। করটিয়া জমিদার বাড়ির মসজিদ থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। যারা একসময় হেযবুত তওহীদের বলা যায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন, তারাই এমামুয্যামানের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে অপপ্রচারে নামল। কীভাবে এই বইটির প্রচার বন্ধ করা যায় তা নিয়ে তারা বড় বড় হুজুরদের কাছে যাতায়াত শুরু করল। ধর্ম অবমাননা অর্থাৎ ব্লাসফেমির অভিযোগ আনা হলো এমামুয্যামানের বিরুদ্ধে। তারা ভাড়া করল চরমোনাই পীর ফজলুল করিমকে। পীর ফজলুল করিম চলে গেলেন করটিয়ায় একটি ওয়াজ মাহফিলে। সেখানে তিনি এমামুয্যামানকে 'কাফের' বলে ফতোয়া দিয়ে আসলেন। আর বইটির প্রচার বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানালেন। যারা তাকে এনেছিল তাদেরই একজন পীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, 'হুজুর আপনি কি বইটা পড়েছেন।' তখন পীরসাহেব নাকি বলেছিলেন যে, 'না পড়ি নাই। রাস্তায় আসতে আসতে একটু উল্টে পাল্টে দেখেছি। পুরাই ইসলামবিরোধী কথাবার্তা।'

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটেও একটা সমাবেশ করে ধর্মব্যবসায়ীরা এই বইয়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বইয়ের কিছু লাইন উল্লেখ করে অভিযোগ প্রদান করে। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা মোকাদ্দমা চলতে থাকে। হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে সেসব অভিযোগের জবাব দিয়ে উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করা হয়। আদালত জানতে চায় যে কেন এই বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে না। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রকার জবাব আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বইটি নিয়ে তখন বাংলাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সজাগ-সচেতন যারা তারা বেশিরভাগই কোনো না কোনোভাবে বইটি পড়ে নিয়েছিলেন। এখনও যখন আমাদের রাজনৈতিক যোগাযোগের টিম বিভিন্ন বড় বড় মানুষের কাছে যায়, তারা অনেকেই এই বইয়ের কথা বলে। হয় তারা এটা পড়েছে, অথবা এটা নিয়ে আলোচনা শুনেছে। বইটি পড়েছে এমন অনেকেই এমামুয্যামানকে পেলে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতেন।

এক ভদ্রলোক সম্পর্কে এমামুয্যামান প্রায়ই স্মৃতিচারণ করতেন। একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হয় তাঁদের। ভদ্রলোক এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনার বইটা পড়েছি। আপনি তো বর্তমান ইসলামের মাথার মাঝখান বরাবর বাঁশের লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মেরেছেন। আচ্ছা বলেন তো, এই বই লেখার পর আপনি বেঁচে আছেন কীভাবে?" এই গল্প বলতে গিয়ে এমামুয্যামান হেসে গড়িয়ে পড়তেন।

আরেক ভদ্রলোক এমামুয্যামানের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছিলেন সেলিমস্ ক্লিনিকে। ভারতের লখনৌতে অবস্থিত বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা থেকে পাশ করা একজন বিরাট মাওলানা, পণ্ডিত ব্যক্তি। নামের শেষে নদভী দেখেই এমামুয্যামান ভাবলেন, ওরে বাবা, নাদভী! আজকে তো প্রশ্ন করে আমার খবর করে ফেলবে। যাহোক এমামুয্যমান তাকে নিয়ে আসার জন্য বললেন। ভদ্রলোক এসে এমামুয্যামানের কাছে বললেন, আমি এ ইসলাম ইসলামই নয় বইয়ের রাইটারের সাথে কথা বলতে চাই। এমামুয্যামান বললেন, জি বলুন, কী বলতে চান। ভদ্রলোক বললেন, না, আমি তো

রাইটারের সাথে কথা বলতে চাই। এমামুয্যামান আবারও বললেন, জি বলুন। তখন ভদ্রলোক কপালে চোখ তুলে বললেন, আপনি এই বই লিখেছেন!!! আমি তো ভাবলাম...। তারপর তিনি দুই হাত প্রসারিত করে বললেন, আপনি তো ইসলামের এক দিগন্ত খুলে দিয়েছেন।' এমামুয্যামান তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যে, যাক, ভদ্রলোক পজিটিভ। ঝগড়া করতে আসেননি। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন যে ইসলাম নিয়ে এত মারাত্মক একটা বই যিনি লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই হবেন দাড়ি-টুপি জোব্বা পরিহিত বিরাট কোনো মওলানা।

এমামুয্যামান বড় বইয়ে তাঁর লেখার সাহিত্যমান সম্পর্কে মাঝেমধ্যে জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ২০০৯ সালের দিকে দাজ্জাল নিয়ে যখন ডকুমেন্টারি বানানো হয়, তখন সেটার স্ক্রিপ্ট আমি করেছিলাম। শুরুতেই বড় বই থেকে কয়েকটি লাইন নিয়েছিলাম, "আজ পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের উপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের উপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের উপর ধুর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা।" ডকুমেন্টারি দেখানোর সময় এমামুয্যামান জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'এমামুয্যামান, ডকুমেন্টারি কেমন হয়েছে সেটা তো আপনি বলবেন।' তিনি বললেন, 'আরে সেটা না, আমার লেখা এই লাইনগুলো কেমন হয়েছে, ভালো হয়েছে?' আমি কী আর বলব? বড় বই থেকে এই কয়টা লাইনই দাজ্জালের ঐ স্ক্রিপ্টে নিয়েছিলাম। আমি বললাম, 'এমামুয্যামান, খুব সুন্দর হয়েছে লেখা, খুব বড় মাপের সাহিত্যিকদের পক্ষেই এভাবে লেখা সম্ভব। আমি যতবার পড়ি, আমার শরীরে হরমোনের শীতল স্রোত বয়ে যায়।' শুনে উনি বললেন, 'তাই না? ভালোই লিখেছি তাহলে, কী বলো!' উনার মুখে তৃপ্তির হাসি। আমি জানি, এটাই হচ্ছে সৃষ্টি সুখের উল্লাস। একজন শিল্পী যখন তাঁর সৃষ্টির স্বীকৃতি পান, কেবল অপরের থেকে নয়, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যখন নিজে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হন, তখনই এমন আনন্দের হাসি তাঁর মুখে ফুটে ওঠে। বড় বইয়ে অনেক দুর্লভ ইতিহাসের বই থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে বইগুলো ইংরেজিতে লেখা। এই ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলোর অনুবাদ কেমন হল সেটা জানারও একটা কৌতূহল তাঁর মধ্যে ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমি যে ট্রান্সলেশন করেছি, সেগুলো কেমন হয়েছে? লোথ্রপের কথাগুলোর বাংলা কেমন করেছি?' এমামুয্যামন 'জেহাদ আত্মরক্ষামূলক নয়- আক্রমণাত্মক' অধ্যায়ের কথা বোঝাচ্ছিলেন। লাইনগুলো হলো- Forgetting the chronic rivalries and blood feuds which had consumed their energies is internecine strife, and welded into a glowing unity by the fire of their new found faith, the Arabs poured forth from their deserts to conquer the earth for Allah the One true God (The New World of Islam- Lothrop). এমামুয্যামান এর অনুবাদ করেছেন, "যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষানুক্রমিক রক্তাক্ত বিবাদের দরুন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হল- **এক এবং সত্য আল্লাহর জন্য পৃথিবী জয় করতে**।" আমি বললাম, 'যেমন শক্তিশালী ইংরেজি, তেমন শক্তিশালী বাংলা। এর চেয়ে ভালো আর কী হবে?'

→ তিনি প্রায়ই আফসোস করতেন যে এই বইটা কেন আল্লাহ বন্ধ করে রাখলেন। পরে আবার নিজেই বলতেন, 'সব কিছু তাঁর হিসাব আছে। এই বইয়ের যে ধাক্কা সেটা সামাল দেওয়ার মত মুজাহিদ হয়তো আমাদের হয়নি, এজন্যই এটা আল্লাহ বন্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ হোক, চরিত্র হোক, দেখবা আল্লাহ আবার ঠিক করে দিবেন। তোমরা চেষ্টা করো, কিন্তু তাঁর নির্ধারিত সময়ের আগে হাজার চেষ্টা করেও লাভ হবে না, এটাও মাথায় রাখবা।' তারপর আবার বলতেন, 'বড় বই যখন লিখেছি, তারপর আল্লাহ আমাকে আরো মেলা জিনিস দিয়েছেন। কর্মসূচিই তো তখন পাই নাই। এখন যদি লিখতে যাই তাহলে দেখবা অনেক কিছুই আগেরটার মত থাকবে না।' বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। বড় বইটা ইংরেজি করতে গিয়ে যখন তিনি তিনি 'দ্য লস্ট ইসলাম' লিখায় হাত দিলেন, দেখা গেল সেটা আরেকটা বই হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কাঠামোই আলাদা।

আজকে ২০২৫ সালে এসে পিছনের দিকে যখন ফিরে তাকাই, তাঁর সেই সব কথা কানে বাজে। তখন একটু চোখ জ্বালা করে। আজকে সেই বইয়ের প্রতিটি শিক্ষা পত্রিকার পাতায়, মাননীয় এমামের বক্তব্যে নানাভাবে, আরো তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণ্য হয়ে, বিভিন্ন সহজবোধ্য রূপে ও কলেবরে মানুষের কাছে হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদারা পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই যে সোনার অক্ষরে তিনি লিখে গেছেন, "আমি চেষ্টা করেছি হাজার বছরের ফেকাহ, তফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম) ইসলাম চাপা পড়ে রয়েছে, সেই ইসলামকে, সেই দীনুল কাইয়েমাকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার করে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে", সেই উপস্থাপন করার উত্তরদায়িত্ব যেন আমাদের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়, মহামহীম আল্লাহর কাছে সেটাই একমাত্র প্রার্থনা।

৫ আগস্টের অভিজ্ঞতা

কেমন ছিল সেদিনের নোয়াখালী?

শারমিন খানম

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সাথে আমার দীর্ঘ বিশ বছরের পথচলা। এই দীর্ঘ সময়ে আমি বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। মহামান্য এমামুয্যামানের অন্তর্ধানের পর ২০১২ সালে প্রথম বহির্মুখীর আহ্বান আসে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা স্বপরিবারে বহির্মুখী হয়ে যাই। এরপর ২০১৯ সালে নোয়াখালীকে কেন্দ্র করে আবারও বহির্মুখীর ডাক আসে। সেই ডাক ছিল একটি নবজাগরণের সূচনা। তখন থেকেই নোয়াখালী কেন্দ্রিক আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ শুরু হয়। আমরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি, যেখানে আমাদের সন্তানরা পড়াশোনা করবে। তাদের গড়ে তোলা হবে আমাদের আদর্শের আলোকে। মাননীয় এমামের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা চলে যাই প্রাণের স্পন্দন নোয়াখালীতে। আমরা বসবাস করতাম নোয়াখালীর বিপুলাশার এলাকায়। আমাদের সঙ্গে সেখানে আরও প্রায় দুই থেকে তিন শত ভাই-বোন একত্রে বসবাস করতেন। মূলত এখান থেকেই চাষিরহাট এলাকায় আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হত।

নোয়াখালীতে আন্দোলনের কার্যক্রম ও শৃঙ্খলা অন্য যেকোনো শাখার থেকে আলাদা। সেখানে সকল কিছুতে আছে সামরিক ছাপ, গভীর জাতীয়তাবোধ ও দায়িত্ববোধের নিখুঁত মিশ্রণ। যারা বহির্মুখী হয়ে এখানে আসেননি, তারা এই বাস্তব চিত্র বুঝতে পারবেন না। নোয়াখালীতে আমরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য ছাড়া বাইরের থেকে কিছুই ক্রয় করতাম না। খুব প্রয়োজন দেখা দিলে, শুধুমাত্র আমিরের অনুমতির ভিত্তিতেই কেনা হত। এখানে আমাদের নবসভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য ভাই-বোনদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, স্বেচ্ছাশ্রম ও আত্মত্যাগ দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। আমি তাদের দেখে বহুবার আবেগে আপ্লুত হয়েছি, চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। জাতির প্রতি ভালোবাসা, জাতীয়তাবোধ কী জিনিস তা আমি নোয়াখালী থেকেই শিখেছি। মাননীয় এমামের নতুন নতুন দিকনির্দেশনা, জুমার দিন শত শত নতুন মানুষের যোগদান, নিত্যনতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা, নিয়মিত মিটিং, প্রশিক্ষণ সব মিলিয়ে বহুমুখী ব্যস্ততায় সময় কাটে আমাদের নোয়াখালীতে।

এরমধ্যে ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে দেশে শুরু হয় কোটা আন্দোলন। শুরুতে আন্দোলন ছোট থাকলেও ক্রমেই সেটা বড় আকৃতি ধারণ করে। জুন-জুলাইয়ে এসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি একদম টালমাটাল হয়ে

পড়ে। ঘন ঘন দেশে কারফিউ জারি হতে থাকে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুরো দেশ থেকে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এমন একটি থমথমে পরিস্থিতিতে আমাদের সময় কাটতে থাকে নোয়াখালীতে। দেশের পরিস্থিতি ভালো নয় বুঝতে পেরে জুলাইয়ের শেষ দিক থেকেই মাননীয় এমাম আমাদের স্পেশাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা শুরু করেন। সবাইকে জেহাদের জন্য শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এরই মধ্যে আমাদের প্রায় দিনই নির্দেশনা আসতে থাকে যে, আপনারা প্যান্ট, জুতা পরে রেডি থাকেন। যেকোনো সময় ডাক আসতে পারে। তাই সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকেই আমরা বাসায় অবস্থান করতাম। আমি তখন আলামিন মির্জা আমিরের ১৪ নং পয়েন্টে ছিলাম। বোনদের দায়িত্বে দু'জন ছিলাম। আমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কে কাদের দায়িত্ব পরিচালনা করবে। আমরা শিফট করে করে রাত জেগে পাহাড়ার দায়িত্ব পালন করতাম কারণ কখন আমিরের কোন নির্দেশনা আসে। সবাই পুরোপুরি সামরিক জীবনে চলে গিয়েছিলাম। আগস্ট মাস আসতেই পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে শুরু করে। প্রতিটা দিন আমাদের কাটতে থাকে কঠিন শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। বলতে গেলে প্রায় সারাদিনই আমরা পোশাক পরে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতাম। এভাবেই ৪ই আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকে।

৫ আগস্ট সকালে আমরা সবাই পরিকল্পনা করি আজকে একত্রে শারীরিক প্রশিক্ষণ নিব। নির্ধারিত সময়ে সবাই একত্রিত হয়ে আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। প্রশিক্ষণ শেষে বোনেরা কথাবার্তা বলি, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। জোহরের ওয়াক্ত হলো সবাই জামায়াতে সালাহ কায়েম করে এবং নিজ নিজ বাসায় চলে যাই। হঠাৎ দুপুর তিনটার দিকে সন্ত্রাসীদের বিশাল লম্বা এক মিছিল মহাসড়ক দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ওরা স্লোগান দিতে থাকে যে 'ভুয়া ভুয়া, হিন্দু হিন্দু, হেযবুত তওহীদ হিন্দু, হেযবুত তওহীদের আস্তানা ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও'। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি ঘোলা হতে শুরু করে। স্লোগান দিতে দিতে বিশাল মিছিলটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এদিকে আমাদের থেকে ১০ মিনিট দূরত্বে মোর্শেদ আলমের ছয়তলা বিল্ডিংটির দিকেও তারা যেতে থাকে। সেখানে পুরো বাসাজুড়ে আমাদের ভাইবোনরা থাকে। সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপ সেখানে গিয়ে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট, হামলা শুরু করে। তারা লুটপাট করে পুরো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এককথায় বলতে গেলে এই বিল্ডিংয়ের সব ভাইবোন, বাচ্চাদের একবারে পুড়িয়ে মেরে ফেলার নীলনকশা করে। এই এলাকার সবাই যেহেতু জানে যে কোন কোন বাড়িতে হেযবুত তওহীদের সদস্যরা থাকে। তাই তারা টার্গেট করে করে সেই বাড়িগুলোতে ঢুকে ঢুকেই প্রথমে হামলা করে।

এদিকে আমাদের বিল্ডিংয়ের ভিতরেও সন্ত্রাসীরা উঠতে থাকে। নিচে তারা ভাংচুর, হামলা, লুটপাট চালায়। এই বাড়িতেও আমাদের ছয়টা ফ্যামিলি থাকে। আমরা সব ফ্যামিলি তখন একরুমে অবস্থান করছিলাম। আমাদের সাথে ছিল অসুস্থ শয্যাশায়ী বৃদ্ধ ও শিশুরা। বাসার নিচে চলছে ভয়াবহ তাণ্ডব। আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। আমির আমাদের ফোন করে পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। আমি সার্বিক পরিস্থিতি জানালাম। আমির বললেন, পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক এক এক করে যতদ্রুত সম্ভব আপনারা মাননীয় এমামের বাড়িতে চলে আসেন। আমি জানালাম যে, আমির বাইরে হামলা হচ্ছে, যেকোনো সময় আমাদের বিল্ডিংয়েও হামলা শুরু হবে। বের হবার কোন অবস্থা নেই। কিন্তু আমির যেকোনো মূল্যে সেই স্থান থেকে সরে যেতে বললেন।

→ এরই মধ্যে সন্ত্রাসীরা আমাদের বিল্ডিংয়ের ভিতরেও ঢুকে যায়। তারা প্রতিটা ফ্ল্যাটে গিয়ে গিয়ে দরজা ধাক্কাতে শুরু করে। ওদের হাতে ছিল লোহার রড, স্টিলের লাঠি, হকিস্টিকসহ নানা রকম অস্ত্র। দরজা না খুলাতে তারা এবার দরজায় লাথি ও বাড়ি মারতে থাকে। অবস্থা দেখে আমরা বুঝে যাই যে, আর বেশিক্ষণ আমরা বেঁচে থাকত পারব না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে আর আমাদের উপর হামলা করবে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু বোনের চোখে মুখে অস্থিরতা ও ভীতি দেখতে পেলাম। আমি তাদের সাহস যুগাতে লাগলাম, বললাম যদি দরজা ভেঙে ভিতরে চলেই আসে সবাই যুদ্ধ করে শহীদ হবো ইনশাল্লাহ।

প্রথম চান্সেই যেন শহীদ হয়ে না যাই অন্তত কিছুক্ষণ যেন তাদের ঘায়েল করতে পারি তাই বাসায় যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রস্তুত থাকতে বলা হলো। আমি বোনদের হাতে প্রেসারকুকার, রুটি বানানোর বেলন, তাওয়া, বটি, খুন্তি ইত্যাদি দিলাম। কারণ বাসায় এরচেয়ে বেশি কিছুই ছিল না। উল্লেখ্য যে, ৫ই আগস্টের দুদিন আগ থেকেই ভাইয়েরা সব শহীদী জামে মসজিদে অবস্থান করছিল। বাসাগুলো শুধু আমরা বোনেরা ও বাচ্চারা ছিলাম। এমন সময় আল্লাহর কী সাহায্য আমাদের বিল্ডিংয়ের একজন প্রভাবশালী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এসে ধমকিয়ে সন্ত্রাসীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। প্রথমে তারা যেতে চাইছিল না। কিন্তু লোকটা হুমকি-ধামকিতে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সে স্থানীয় বিএনপির একজন নেতা, আমাদেরকে ভালোভাবে চিনত। এমন সময় আমিরের কড়া কমান্ড আসে যে, এক এক করে আপনারা বাসা থেকে বের হয়ে আসেন। রাস্তায় যাই ঘটুক আপনারা ওইখান থেকে সরে আসেন। আমরা আসমাউ ওয়া আত্তাবেয়্যু বলে আল্লাহর উপর ভরসা করে দরজা খুলে দিলাম।

নিচে তখন ভাঙচুর চলছে। তবুও মনে সাহস নিয়ে আমরা একে একে বেরিয়ে পড়লাম। নির্দেশনা ছিল মাগরিবের আগে বিপুলাসার ত্যাগ করতে হবে। আর আমাকে বলা হয়েছিল, সবাইকে বের করে দিয়ে সর্বশেষ আমি আসব। একে একে সবাইকে বের করে দিতে দিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মাগরিব হতে তখন ৩০ মিনিট বাকি। পরিস্থিতি তখন একবারেই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। রাস্তায় হেযবুত তওহীদ দেখলেই হামলা করছে আর বাসায় থাকলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চাচ্ছে। আমদের বিল্ডিংয়ে তখনও চারটি পরিবার আটকা। এদের মধ্যে রয়েছে দুই বছরের শিশুসহ আরও ছয়টি বাচ্চা। একে একে বের করতে গেলে মাগরিব পার হয়ে যাবে। তাই আমিরের অনুমতি ক্রমে ১৫ জন একত্রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কত যে অকথ্য গালিগালাজ করা হচ্ছিল আমাদের রাস্তায়। তবে আল্লাহর অশেষ করুণা আর মাননীয় এমামের দোয়ার বরকতে আমরা রাস্তায় কিছু মানুষের সহযোগিতা পাই। আমার সাথে ছিল ৭০ বছর বয়সী আমার বৃদ্ধ মা যিনি ঠিকভাবে হাঁটতেও পারেন না। সাথে আরও আমার ছোট দুই বাচ্চা। আমি সবাইকে সাহস দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। কিন্তু আমার অসুস্থ মা জোরে হাঁটতে পারছিলেন না। তার কারণে আমাদের স্লো হাঁটতে হচ্ছিল। এসময় আল্লাহর সাহায্যে দুইজন স্থানীয় লোক দ্রুত গাড়ি ঠিক করে দেয়। আমরা গাড়িতে চড়ে সোজা মাননীয় এমামের বাড়িতে এসে নামি। সাথে সাথে যেন আত্মাটায় প্রাণ ফিরে পাই। এতক্ষণ যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তাতে মনে হচ্ছিল জীবন নিয়ে ফেরা আর কখনো সম্ভব হবে না। কিন্তু আল্লাহর অলৌকিক সাহায্যে একটা ফুলের টোকা পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি রাস্তায়। আল্লাহর যেন তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে পার করেন ওই রাস্তাটুকু আমাদের। এই রহমত পেয়েছি শুধুমাত্র মাননীয় এমামের দোয়া ও আনুগত্য করার কারণে। আমির যখন যা বলছেন আমার টিম অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করেছি।

৫ আগস্টের হামলার পর পুরো নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী জেলার ভাইবোন-শিশুরা নিরাপদে আশ্রয় নিতে মাননীয় এমামের বাড়িতে এসে জড় হয়। প্রায় দেড় হাজার ভাইবোন সব মিলিয়ে। ভাইয়েরা সব মসজিদে আর বোনেরা ছয় তলা বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ফ্লোরে ফ্লোরে অবস্থান নেয়। প্রতিটি রুমে তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই। একরুমে ৩০/৪০ জন শিশু, বৃদ্ধ। সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক আরও ১৫ জন। এত ভিড় আর মানুষজনের ভিতরেও বাচ্চাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, অনৈক্য, গোলযোগ দেখি নি। এত শান্ত আর ভদ্র ছিল প্রতিটি বাচ্চা যেটা দেখে আমি হতবাক হয়েছি। যেখানে স্বাভাবিক সময়ে দুইটা বাচ্চাকে একসাথে রাখা যায় না। সেখানে এতগুলো বাচ্চা একরুমে এত সুশৃঙ্খল এবং ঠাণ্ডা ছিল যে অবিশ্বাস্য। ওরাও হয়ত বুঝতে পারছিল এখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি নেই। এত হুলস্থুল তার উপর এত মানুষের খাবারের আঞ্জাম দেওয়া ছিল আরেক মহাযজ্ঞ। প্রতিবেলায় দেড় হাজার মানুষের রান্না। সে সময়টায় সত্যিকার অর্থেই বুঝেছিলাম যে যুদ্ধে রসদ সরাবরাহ ও রান্না বিভাগের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার ছিল না। ফলে পেট ভরে খাবার খাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম দুদিন আমাদের একমুঠো করে খাবার দেওয়া হত যা কিনা একবার মুখে দিলেই শেষ। আমরা সেটুকুই বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে সান্ত্বনা দিতাম। ছোট বাচ্চাগুলোও সর্বদা প্রস্তুত থাকত যে তার মা শহীদ হলে অন্য খালা মনির কাছে থাকতে হবে। তারা বুঝার চেষ্টা করত কিন্তু মাকে একটু চোখের আড়াল হতে দেখলেই ছল ছল চোখে দুরু দুরু বুকে জিজ্ঞাসা করত তার মা বেঁচে আছে কি না। সব বাচ্চাদের যেহেতু একসঙ্গে রাখা হয়েছিল সেখানে তাদের দেখাশোনার জন্য শিফট অনুযায়ী

বোনেরা দায়িত্বে থাকত। ফলে দীর্ঘসময় দেখা যেত তারা মাকে দেখতে পেত না।

যখন দীর্ঘ সময় পরে তারা মায়ের কাছে আসত, মা বেঁচে আছে দেখে যে কী আনন্দ তাদের চেহারায় ফুটে উঠত সেগুলো মনে হলে এখনো চোখে পানি চলে আসে। ওখানে আমি বোনদের অভ্যন্তরীণ কাজের দায়িত্বে ছিলাম। যেমন: সালাহ কায়েম, সালাহ শিক্ষা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

> *জাতিকে রক্ষার জন্য একটি ছোট্ট জাতির অবিরত টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে দেখেছি চোখের সামনে। মাননীয় এমামের হুকুমের জন্য সবাই সদা প্রস্তুত ছিল। সেই সময়টায় আমার কাছে শুধু মনে হয়েছে এমন দিনের অপেক্ষায় আমরা কতকাল ছিলাম পুরো হেযবুত তওহীদ। যখন পুরো মো'মেন জাতিটি মাননীয় এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে একতাবুর নিচে বসবাস করবো, একমুঠো খাবার খাব। যুদ্ধ করে জীবন দিব। সকল চিন্তা হবে জাতিগত। ৫ আগস্টে পরবর্তী সময়ে নোয়াখালীতে ওই চিত্রটাই দেখেছি।*

সবাই যুদ্ধের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতাম। বোনেদের বিশেষ টিম ছিল যারা সম্মুখ সারিতে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেক টিমের একজন করে দায়িত্বশীল ছিল। আমিও একটি টিমের দায়িত্বশীল ছিলাম। বোন ও শিশুদের নিরাপত্তায় ৬ তলা পুরো বেষ্টনী দিয়ে রাখা হয়েছিল ভাইদের দিয়ে। সারাদিন রাত কর্মযজ্ঞ। সবাই আলহামদুলিল্লাহ সাহসী ছিল। কারো মধ্যে একবিন্দু স্বার্থপরতা দেখিনি। পুরো জাতি একটি শরীরের মত হয়ে গিয়েছিল। যদিও স্বল্প জায়গায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষ থাকায় গোসল, খাওয়া, ঘুমে সমস্যা হত। তবুও এগুলো কখনো কষ্ট মনে হয় নি। শুধু মনে হত শত্রুকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। আমার কাছে মনে হত মসজিদে নববীতে আছি। মনে হত নবীর আমলে চলে গেছি। ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল ভাষায় প্রকাশ করার মত না। বৈরী আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মালায়েকের মতো তারা দিন-রাত পাহারায় থেকেছেন। একজন নেতার প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে দেখেছি ৫ আগস্ট।

মাননীয় এমামের রণকৌশলও ছিল সাংঘাতিক ও অসাধারণ। সেখানে প্রতিটা সেকেন্ডে ছিল হামলার ঝুঁকি। পুরো দেশে সরকারবিহীন টানা দশদিন কী অরাজকতা চলেছে এটা কমবেশি আমরা সবাই জানি। ধর্মব্যবসায়ীরাও সেসময় নোয়াখালীর মাটি থেকে হেযবুত তওহীদকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু আল্লাহরও একটা পরিকল্পনা ছিল। সে মোতাবেক মাননীয় এমাম শত্রুর পরিকল্পনার চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে সেদিন তারা নোয়াখালী থেকে একটা ইটের টুকরা নেওয়ারও সাহস পায় নাই। আমরা প্রতিমুহূর্তে সদা প্রস্তুত ছিলাম। পুরো জাতি আমরা এমামের ডাকের জন্য তৈয়ার ছিলাম। ফলে দেশব্যাপী তাণ্ডব চললে আল্লাহ আমাদের প্রাণকেন্দ্র নোয়াখালীকে আল্লাহ হেফাজতে রাখেন। সেদিনের পরিস্থিতি আসলে কেমন ছিল তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না। তবুও কিছু পাতা লিখলাম যাতে হেযবুত তওহীদের ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে সেদিনের ঘটনাগুলো। আল্লাহর দরবারে আমি লাখো কোটি শুকরিয়া যে এমন একটি মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরেছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এভাবেই যেন আমৃত্যু লড়ে যেতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।

মেসার্স সাবিদ এণ্টারপ্রাইজ

✓ উন্নতমানের কীটনাশক
✓ মানসম্মত স্প্রে মেশিন
✓ বিভিন্ন জাতের সার ও বীজ
✓ খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় ব্যবস্থা

পরামর্শে: মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, ডিপ্লোমা কৃষিবীদ

ঠিকানা: শঠিবাড়ী (বৈরাতির মোড়), মিঠাপুকুর, রংপুর
যোগাযোগ: ০১৭২৩৯৭৪৫৭৯, ০১৭৬৫৯৬৫২১৭

অলৌকিক ঘটনা

"ঝড় আল্লাহর - অনুষ্ঠানও আল্লাহর"

আশেক মাহমুদ, আঞ্চলিক আমির, রাজশাহী

গত ১ মে কুষ্টিয়ার দশমাইল মুন্সিপাড়ায় হেযবুত তওহীদের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬ হাজার উপস্থিতির মধ্যে আমারও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। বগুড়া থেকে সকাল ৭টায় জনসভার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে সকাল ১১টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হই। আমাদের প্রতি নির্দেশনা ছিল সাড়ে ১২টার মধ্যে উপস্থিত হওয়ার। তাই সবার আগেই উপস্থিত হতে পেরে একটু সময় পেয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিলাম।

তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তীব্রতা এবং গরমের অনুভূতি দুটোই বাড়ছিল। প্রোগ্রামস্থলটি ফাঁকা মাঠ ছিল এবং আশেপাশে কোনো ছায়াঘেরা স্থানও ছিল না। মাঠের ফাঁকা এবং অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় জনসভার জন্য প্যান্ডেল ও মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল। পর্যাপ্ত সাউন্ড সিস্টেম এবং বাতাসের জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিদ্যুতের ভোল্টেজ কম থাকায় ফ্যানগুলো খুব আস্তে ঘুরছিল, যা গরমের অনুভূতি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ান চেষ্টা করেও পর্যাপ্ত ভোল্টেজ সরবরাহ করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায়ই প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আয়োজকদের শুভেচ্ছা বক্তব্য চলছিল। এরই মধ্যে বেলা প্রায় ২টার দিকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় এমাম এসে পৌঁছান। ইতিমধ্যে প্রোগ্রামস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। অনেক লোক বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং পাশের উঁচু টিলায় ঘাসের উপর বসে পড়েন।

মাননীয় এমাম যখন অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছান তখন সকলের দৃষ্টি ও মন যেন আল্লাহ উনার দিকেই ঘুরিয়ে দিলেন। হাজার হাজার নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মাঝেও নেমে আসে নিস্তব্ধতা। সবাই যেন একাগ্র হয়ে এক অমীয় সুধা পানে তৃষ্ণার্তের মতো মাননীয় এমামের পানে তাকিয়ে থাকেন। যথারীতি মাননীয় এমামের মহাগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ শুরু হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই একাগ্রচিত্তে সেই ভাষণ শ্রবণ করতে থাকে। তীব্র গরমের অনুভূতি কোথায় হারিয়ে যায়, সেটা হয়তো অনেকেই খেয়ালই করেননি। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাস শরীরকে শীতল করে দিচ্ছিল।

মাননীয় এমামের প্রথম ধাপের কথা শেষে কেন্দ্রীয় নারী বিষয়ক সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী নারীদের জাগরণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্যের প্রায় শেষ পর্যায়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। তীব্র কালবৈশাখী ঝড় উঠতে

শুরু করে। প্রচণ্ড বাতাসে প্যান্ডেলের কাপড়ের একটা অংশ ছিঁড়ে যায়। সমস্ত প্যান্ডেল কাপতে থাকে। মনে হচ্ছিল পুরো প্যান্ডেলই ঝড়ে উড়ে যাবে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায়। হয়তো প্রচণ্ড ঝড় কিছুক্ষণের মধ্যেই আছড়ে পড়বে। অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কী করবে, কোথায় আশ্রয় নেবে- কেউই ভেবে পাচ্ছিল না। ঝড় এবং বৃষ্টির কারণে মাঠ কাদায় মাখামাখি হবে ভেবে রিজার্ভ করে নিয়ে আসা বাসগুলো রাস্তায় নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকে। অনেকেই বাস চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে ভাবছিল বাসগুলো হয়তো যাত্রী ফেলেই চলে যাবে।

বৃষ্টি হলে চারপাশে আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের মাঝে কয়েক হাজার নারী এবং শিশু ছিল, যাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা কী করবো অনেকটাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। বৃষ্টি হলে তারা কোথায় আশ্রয় নেবে, ভেবে পাচ্ছিলাম না। এভাবে ঝড়ে যদি প্রোগ্রাম পণ্ড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ঠাট্টা-মশকরা করার সুযোগ পাবে। এটা কি আল্লাহ হতে দেবেন -এসব ভাবছিলাম। মাননীয় এমাম মঞ্চেই বসা ছিলেন। মঞ্চ যেন দুলছিল। আমরা মাননীয় এমামের পাশেই অবস্থান নেই। কিছুটা হতভম্ব হলেও পরক্ষণেই ভাবলাম, আমাদের মাঝে তো আল্লাহর মনোনীত এমাম উপস্থিত রয়েছেন। কাজেই মাননীয় এমামের প্রোগ্রাম ঝড়ে পণ্ড হতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন। নিজাম আমীর ঘোষণা দিলেন- কেউ চিন্তা করবেন না, ঝড় উঠলেও বৃষ্টি হবে না। ইনশাআল্লাহ আমরা প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবো। ঠিক তখনই মাননীয় এমাম সবাইকে স্থির হয়ে শান্ত হয়ে বসতে বললেন এবং বক্তব্য আরম্ভ করলেন। মাননীয় এমাম বললেন, "কেউ ভয় পাবেন না। অস্থির হবেন না। এই ঝড় আল্লাহই পাঠিয়েছেন, আর এই প্রোগ্রামও আল্লাহর। কাজেই আমরা বক্তব্য চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।"

প্যান্ডেলের কাপড় একটা একটা করে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। মাননীয় এমাম বললেন, "প্যান্ডেলের কাপড়ের দিকে কারো দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন নাই, ওটা উড়ে যাক।" আমাদের শৃঙ্খলার ভাইদের নির্দেশ দিলেন দ্রুত প্যান্ডেলের কাপড় খুলে দিতে। বললেন, "আমরা প্রয়োজনে খোলা আকাশের নিচে জনসভা চালিয়ে যাব। মাথার উপর প্যান্ডেল আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের তো খোলা আকাশের নিচেই প্রোগ্রাম করার কথা।" সবাইকে বললেন, "আপনারা কি বাড়ি চলে যেতে চান?" উপস্থিত সবাই মাননীয় এমামের বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে ঝড়কে উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচেই বসে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গিয়ে শান্ত, স্থির, আরামদায়ক পরিবেশ হয়ে গেল। এক ফোঁটা পানিও কারো গায়ে পড়লো না। মাননীয় এমাম বললেন, "আপনারা ভেবেছেন প্রোগ্রাম শেষ -এখন দেখেন আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করলেন। ঝড় থামিয়ে আল্লাহ প্রোগ্রামের সময় আরো বাড়িয়ে দিলেন।"

উপস্থিত সবাই আল্লাহর সাহায্যের বিরাট একটা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হলাম। এটা যে একটা বিরাট অলৌকিক ঘটনা, সেটা প্রোগ্রাম শেষে রওনা দেয়ার পরে আরো ভালো করে উপলব্ধি করলাম। কয়েক কিলোমিটার আসার পর দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে বৃষ্টির পানি জমে আছে। বগুড়া পর্যন্ত প্রায় সারা রাস্তাতেই বৃষ্টির পানি জমে আছে। বুঝতে পারলাম- প্রোগ্রামস্থলে যে ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড় পরবর্তী আশেপাশের সব জায়গাতেই বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানস্থলে কোনো বৃষ্টিই হয়নি। বরং অত্যন্ত আরামদায়ক, শান্ত, স্থির পরিবেশে আল্লাহ আমাদের মাননীয় এমামের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করেছেন। সারাদিনের প্রোগ্রামে কেউ কোনো ক্লান্তি অনুভব করেনি। ঠিক এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী ছিলাম রংপুরের তারাগঞ্জের এক জনসভায়। যেখানে একদিন আগে প্রচণ্ড ঝড়ে চরমোনাইয়ের মাহফিল পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন আমাদের প্রোগ্রামের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। অনুষ্ঠানস্থলের মাঠে পানিতে ডুবে গিয়েছিল, প্যান্ডেল ভিজে গিয়েছিল। যথাসময়েও কোনো লোকজন ছিল না। এ অবস্থায়ও আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে উপস্থিত ভাইয়েরা মাঠের পানি পরিষ্কার করা শুরু করি, প্যান্ডেল ঠিকঠাক করে প্রোগ্রাম শুরু করি। মাননীয় এমামের বক্তব্যের সাথে সাথে কোথা থেকে হাজার হাজার লোক এসে মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে- খেয়ালই করিনি। আসলে আল্লাহর সাহায্য আমরা বেশিরভাগই উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত এমামের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে এবং থাকবেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সাহায্য উপলব্ধি করার এবং শোকর আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমাদের জীবন এবং সম্পদ কবুল করুন। আমিন।

আল্লাহর সাহায্য

কুষ্টিয়া জনসভা: অতীতের শত্রু আজকের বন্ধু

আজিমুল হক

করোনা-পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কোনো বড় জনসভা হয়নি। একাধিকবার জনসভা করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। হাজার হাজার লোক নিয়ে জনসভা তো দূরের কথা, ছোটখাটো আলোচনা সভা বা মতবিনিময় সভার অনুমতি পেতেই জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে দৌড়াতে দৌড়াতে জুতার সুকতলা ক্ষয় হয়ে যায়। অর্থের অপচয় হয়। বার বার গিয়েও একটা অনুমোদন আনা যায় না। এই নিদারুণ বাস্তবতাই ছিল আমাদের অতীত। কিন্তু এবারের ঘটনা পুরোপুরি ভিন্ন।

মাননীয় এমাম সিদ্ধান্ত দেন পহেলা মে কুষ্টিয়ার নয়-মাইলে কয়েক হাজার মানুষের জনসভা করতে হবে। সেই মোতাবেক মাননীয় এমামের দিকনির্দেশনা মোতাবেক জনসভার প্রস্তুতি শুরু করেন আমিররা। সর্বপ্রথম লাগবে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের থেকে অনুমোদন। সে অনুযায়ী আমাদের একটি টিম জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বললাম এবং মাননীয় এমামকে নিয়ে জনসভা করতে চাওয়ার ব্যাপারে জানালাম। আশ্চর্যজনকভাবেই তিনি জনসভার ব্যাপারে শুনে কোনো দ্বিধা বা অতিরিক্ত কথা না বলেই জনসভার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি ভেড়ামারা উপজেলা আমির মিজানুর রহমান মজনুর সঙ্গে থানায় যেয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতেও রাজি হলেন। তো থানায় যাওয়ার পর সচরাচর যা হয়, ওসিকে পাওয়া গেল না। ওসিকে আমাদের ব্যাপারে খবর দেওয়া হলো। থানা থেকে জানালো ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই ওসি ফিরবেন। তাই আমির এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ওসির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই অপেক্ষার পালা যেন শেষই হয় না। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা করে করে তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তখনও ওসি আসে নি। এদিকে জনপ্রতিনিধিও আমিরের সাথে এই তিন ঘণ্টা ধরেই ওসির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অতঃপর ওসি সাহেব ফিরলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জনসভার অনুমতি নিশ্চিত করে তবেই থানা থেকে বের হন তিনি। এমন একটা সময় ছিল যখন জনপ্রতিনিধিরা আমাদের সাথে কথা বলার জন্য সামান্য সময়টুকুও দিত না। একটু কথা বলার জন্য বারবার তাদের দ্বারে দ্বারে যেতে হত। সেই তারা এখন হেযবুত তওহীদের জনসভা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। হেযবুত তওহীদের পেছনে যে আল্লাহ আছেন এসব ঘটনাই তার বাস্তব প্রমাণ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার আরেকটি উপলব্ধি হচ্ছে, মাননীয় এমাম যে আল্লাহর মনোনীত এমাম তার প্রমাণ মাননীয় এমামের কথা, শব্দ, বক্তব্য এটা আমরা সবাই জানি। এবার তার চাক্ষুষ প্রমাণও আমি কাজ করতে গিয়ে পেয়েছি।

জনপ্রতিনিধির সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগেই মাননীয় এমাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দেন। কীভাবে তার সাথে কথা বলা হবে, কোন আঙ্গিক থেকে কথা বলতে হবে পুরো ছক এঁকে বুঝিয়ে দেন তিনি। মাননীয় এমাম এটাও বলেন যে, কোন সমস্যা এবার হবে না, সবকিছু ঠিকভাবে হবে। বাস্তবে গিয়ে তাই হয়। আমরা তাদের সাথে দেখা করতে যাব কি, মনে হচ্ছে যেন তারাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। আমরা সেখানে যেয়ে এমামের দিকনির্দেশনা মোতাবেক জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলি। ফলে জনসভা বাস্তবায়ন করতে প্রতিটি পদে পদে আল্লাহর সাহায্য অনুভব করতে থাকি। জনসভার আয়োজন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অংশ অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়। এমনকি জনসভার আগ মুহূর্তেও প্রচণ্ড বৈরি আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে আমাদের অনুকূল হয়ে যায় এবং আমরা সহীহ সালামতে জনসভা সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

নতুন মুখ– নাম: ইউজারসিফ

জন্ম তারিখ : ০৪ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : নাহিদুল ইসলাম (আমির, মালয়েশিয়া প্রবাসী শাখা)
মাতা : ফারজানা আফরিন (সাহিত্য সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ জেলা)

নবজাতকের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনায় মাননীয় এমাম ও সকল ভাইবোনের কাছে দোয়াপ্রার্থী

সংশপ্তক

১৪০ কি.মি সাইকেল চালিয়ে মিটিংয়ে হাজির

আব্দুল কাদেরের বয়স ৫৫ বছর। তিনি হেযবুত তওহীদের ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার একজন সদস্য। বয়সে পঞ্চাশোর্ধ হলেও হৃদয়ে তরুণ। মাননীয় এমামের প্রতিটি হুকুমের প্রতি প্রশ্নহীন, শর্তহীন, দ্বিধাহীন আনুগত্য করাই তার বৈশিষ্ট্য। হেযবুত তওহীদে যোগ দেন ২০১৮ সালে। এরপর থেকে আন্দোলনের আদর্শকে বুকে ধারণ করে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন অবিরত। গত ৮ এপ্রিল ঢাকার উত্তরায় ময়মনসিংহ বিভাগের সদস্যদের নিয়ে মাননীয় এমামের একটি মিটিং এর আয়োজন করা হয়। শাখা আমির মারফত তিনি জানতে পারেন যে, মাননীয় এমাম বিভাগের সকল আমির, সদস্য, মোজাহেদ-মোজাহেদাদের উত্তরায় ডেকেছেন। মাননীয় এমামের মিটিং শুনে আব্দুল কাদের তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি মিটিং এ অংশ নিতে ঢাকা যাবেন। যদিও ঢাকা যাওয়ার মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। তখন তিনি আমিরকে জানান যে, তিনি মিটিংয়ে যেতে চান কিন্তু ঢাকা যাওয়ার মতো টাকা তার কাছে নেই।

আমির উনাকে বলেন যে, আপনি নিয়ত করেন বাকিটা আল্লাহ ভরসা। এরপর তিনি ভাবতে থাকেন যে কি উপায়ে তিনি ঢাকা যেতে পারেন। টাকার কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না সেই চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে সিদ্ধান্ত নেন যে মাননীয় এমামের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি প্রয়োজনে বাইসাইকেল চালিয়ে মিটিংয়ে যাবেন। যেই কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মিটিং এর আগের দিন অর্থাৎ ৭ এপ্রিল বিকেল ৩ টার সময়। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত। তিনি অবিরত সাইকেল চালিয়ে ময়মনসিংহ জেলা থেকে ঢাকার পথে ছুটতে থাকেন। রাত হলে দীর্ঘ সময় সাইকেল চালিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ফলে সেদিনের মতো যাত্রা বিরতি নিয়ে রাতে অবস্থান করেন তার ভাইয়ের বাসা গাজীপুর টঙ্গীতে। রাতটা সেখানে পার করে পরের দিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করেন বাইসাইকেলে। অবশেষে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এসে উপস্থিত হন মিটিং স্থলে। আনন্দমনে যোগদান করেন মাননীয় এমামের মিটিংয়ে। মিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে তার আমির যখন ঘটনাটি সবার সামনে উপস্থাপন করেন তখন সবাই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। মাননীয় এমাম তার কাছে এ ঘটনার মন্তব্য জানতে চান। তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাজের জন্য বের হলে তখন স্বয়ং আল্লাহই সাহায্যকারী হয়ে যান। এটি বলে বুঝানো যাবে না।' অবাক করা বিষয় হচ্ছে একজন যুবক পুরুষ যেখানে ১৪০ কিমি রাস্তা সাইকেলে চালিয়ে যাওয়ার সাহস করতে পারে না, সেখানে ৫৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ তা করে দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বাস্তবে আল্লাহর কাজের জন্য মন থেকে নিয়ত করলে পৃথিবীর কোন বাধাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তখন স্বয়ং আল্লাহই সহায় হন। তার প্রমাণ স্বয়ং আব্দুল কাদের।

মোহনগঞ্জ কুটির শিল্প!

বাঁশ ও বেতের তৈরি সকল প্রকার ঘরোয়া সামগ্রীর নির্ভরযোগ্য সমাধান

গৃহস্থলী যাবতীয় বাঁশের তৈরি চালুনি, কুলা, ডোলা, ঝাঁঝরি, ধামা, খাঁচা, মাছ ধরার ফাঁদ (পলো, চাঁই, বিনা), বাঁশের ঝাড়, ফুলদানি বা শো-পিস, বাঁশের মাচাসহ যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় হরেক রকমের আসবাবপত্র।

প্রধান নির্বাহি: মো. ওমর ফারুক যোগাযোগ: ০১৭২৬৬৭৯৯৬২

ইতিহাস

ওমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস

এক তরুণ সাহাবীর ঈমানদীপ্ত শাহাদাৎ

মোখলেসুর রহমান

মাত্র ১৬ বছর বয়সী একজন সাহাবী। কৈশোর পেরিয়ে তখনো যৌবনে পদার্পন করেন নি তিনি। এদিকে হঠাৎ করেই একদিন ডাক এসে যায় যুদ্ধের। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথ মবারের মতো সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত হোন সাহাবীরা। সবাইকে ব্যাপক আগ্রহের সাথে রণসাজে সজ্জিত হতে দেখে ওই বালক সাহাবীও যুদ্ধে যোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে তাকে অনুমতি দিলেন না আল্লাহর নবী। সবার সাথে যুদ্ধযাত্রায় সামিল হতে না পারার দুঃখ ওই বালককে কাতর করে তোলে। কষ্টে-হতাশায় তিনি কাঁদতে শুরু করেন। যুদ্ধে যোগ দিতে এক বালকের এমন ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহর নবী শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুমতি দিলেন। আর তারপর একেবারে সম্মুখ সারিতে অবস্থান নিয়ে তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যান আর এমন এক ইতিহাস রচনা করেন, যা ছিল এক কথায় অবিশ্বাস্য। যে সাহাবীকে নিয়ে আমাদের আজকের গল্প তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. এর আপন ছোট ভাই। পারস্য বিজেতা মুসলিম জেনারেল সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. এর নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনে থাকবেন। তাঁর নেতৃত্বেই মুসলিমরা আজকের ইরাক-ইরান জয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা, অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। ইসলাম প্রচারের একেবারে শুরুর দিকে তিনি আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে যান। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. এর একজন ছোট ভাই ছিলেন যিনি বালক বয়সেই ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পরেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বড় ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় কোরায়েশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যখন সাহাবীরা মদীনায় হিজরত করেন, তখন ওই বালকটিও সাদ রা. এর সাথে মদীনায় চলে আসেন। হিজরতকালে তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। কিশোর ওই সাহাবীর নাম ওমাইর রা.। আরবের সংস্কৃতি অনুযায়ী পিতার নাম অনুসারে তাকে ডাকা হতো ওমাইর বিন আবু ওয়াক্কাস। মদীনায় হিজরতের মাত্র দু'বছর পরের ঘটনা। মক্কার কোরায়েশদের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র অভিযানের ডাক দেন রসুল (সা.), যা পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রসুল (সা.) তার সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। শহরের বাইরে এক জায়গায় এসে তিনি বিরতি নেন এবং এই বিরতিকালে যুদ্ধক্ষম সাহাবীদেরকে বাছাই করেন। যারা বয়সে ছোট ছিলেন, রসুল (সা.) তাদেরকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই বাছাই প্রক্রিয়া চলাকালে সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. লক্ষ্য করলেন, তার ছোট ভাই উমাইর অস্থিরভাবে সৈনিকদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন করছেন আর নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে উমাইর! তোমার কি হয়েছে? জবাবে উমাইর রা. বললেন, ভাই, আমার ইচ্ছা আমি এই যুদ্ধে অংশ নেব। হয়তো আল্লাহ আমাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বয়স কম হওয়ার কারণে হয়তো রসুলাল্লাহ আমাকে এই যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেবেন না।

কিছুক্ষণ বাদে উমাইর রা.'র এই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হলো। আল্লাহর নবী তাকে মদীনায় ফিরে যেতে বললেন। রসুলের এমন সিদ্ধান্ত জানার পর উমাইর রা. ব্যাকুলভাবে কান্না করতে থাকেন। যুদ্ধে

অংশ নেয়ার জন্য এক ১৬ বছর বয়সী বালকের এমন তিব্র আকাঙ্ক্ষা আর শাহাদাতের বাসনা দেখে আল্লাহর নবী শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। তিনি উমাইর রা. এর জন্য দোয়া করলেন এবং তাকে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দিলেন। নিজের পবিত্র হাতে রসুল (সা.) উমাইর রা. এর তলোয়ার খাপে যুক্ত করে দিলেন। বড় ভাই সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস তাকে যুদ্ধে তলোয়ার চালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিলেন। যে বয়সে আমরা বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে বেড়াই, নিজের শখ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরি, সেই শখ পূরণ না হলে মাটিতে গড়াগড়ি করে কান্না করি, সেই বয়সে একজন সাহাবী বায়না ধরলেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। আল্লাহর সত্যদীনকে বিজয়ী করতে সাহাবীরা কতটা পাগলপারা ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায় এই ঘটনা থেকে।

যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন দেখা যায় শত্রু বাহিনীর তুলনায় মুসলিমরা সংখ্যায় মাত্র তিনভাগের একভাগ। কাফের বাহিনী শুধু সৈন্য সংখ্যায় এগিয়ে ছিল তা নয়, বরং অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, উট সহ প্রতিটি বিষয়ে তারা বহুগুণ শক্তিশালী ছিল। তথাপি এই প্রতিকূল পরিস্থিতি আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীদেরকে এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। তারা ছিলেন আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সত্যদীনের জন্য জীবন কোরবান করতে সদা প্রস্তুত। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যান। তাদের প্রথম আঘাতেই মুশরিক বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পরে আর এক পর্যায়ে তারা পালাতে শুরু করে। অর্জিত হয় ইসলামের প্রথম যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের গৌরব। আর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সেই গৌরব অর্জনের পথ সহজ করে দেন ১৪ জন মৃত্যুঞ্জয়ী সাহাবী। সেই ১৪ জনের একজন ছিলেন বালক উমাইর বিন আবু ওয়াক্কাস রা.। তিনি বয়সে ছোট ছিলেন, কিন্তু সাহসে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। শারীরিক শক্তিতে তিনি দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। তিনি নিজেকে বড়দের পেছনে আড়াল করেন নি কিংবা শত্রু থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরেও থাকেন নি। বরং তিনি কোরায়েশদের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা আমর ইবনে আবদ উদের মুখোমুখি হোন। এই আমর লোকটি এতটাই শক্তিশালী আর বিশাল আকৃতির ছিল যে, ইতিহাসের লেখকেরা বিভিন্ন গ্রন্থে তাকে দৈত্য হিসেবে সম্বোধন করেছেন। পরবর্তীতে উহুদের যুদ্ধে শেরে খোদা হযরত আলী রা. এই দৈত্যাকৃতির লোকটিকে হত্যা করেছিলেন। বিশাল আকৃতির এই দৈত্যটি যখন হুংকার ছেড়ে এগিয়ে আসে, তখন বালক উমাইর রা. তাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেন। তবে খুব বেশিক্ষণ তিনি টিকে থাকতে পারেন নি। আমর ইবনে আবদ উদের তলোয়ারের আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন, আর সেই কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

উমাইর ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. বদরের যুদ্ধের বিজয়ে হয়তো বড় কোনো ভূমিকা পালন করেন নি। হয়তো তিনি এমন কোনো কীর্তি রেখে যান নি যা তাঁর নাম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের তালিকায় জায়গা করে দেবে। কিন্তু একজন ১৬ বছর বয়সী বালক হয়েও আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়ার যে ব্যাকুলতা তিনি দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে আমর ইবনে আবদ উদের মতো দৈত্যের মুখোমুখী হওয়ার যে দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়, অভাবনীয়। ইসলামের ইতিহাসে পরবর্তীকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো যেসব দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার উত্থান ঘটেছিল, যারা বালক বয়সেই যুদ্ধের ময়দান দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন, তাদেরকে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন ওমাইর ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই অসম সাহসী বালকের ন্যায় আল্লাহর পথে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পাগলপারা সৈনিক হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

কুইজ

- মানবজাতির কাছে দাজ্জালের দাবি কী?
- দাজ্জালের কপালের কাফের লেখা শুধু মো'মেনরা কেন পড়তে পারবে?
- 'দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে'– এ কথাটি দিয়ে রসুলাল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- রাইগর মর্টিস কী? দাজ্জাল প্রতিরোধকারীর রাইগর মর্টিস হয় না কেন?
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের পুরস্কার কী?

উপলব্ধি

এই সময়কে মূল্যায়ন করা

জোবায়ের হাসান

সম্প্রতি হেযবুত তওহীদের কোনো কোনো সদস্য আন্দোলন ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন আন্দোলনের দায়িত্বশীল ছিলেন। আকিদাগত মতপার্থক্যের কারণে তারা আর এই আন্দোলনে নেই। এই ঘটনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার সুবাদে আমার কিছু বিষয় উপলব্ধি হয়েছে, সেটাই আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি।

হেযবুত তওহীদ আন্দোলন গত ৩০ বছরের পরিক্রমায় আজ এমন একটি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যা একটা সময় প্রাথমিক সময়ের মোজাহেদ-মোজাহেদাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল। এমামুয্যামান যখন ছিলেন তখন আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে আমাদের নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হামলা, মামলা, জেল, জরিমানা, যুলুম, নির্যাতন, বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, প্রশাসনের হয়রানি, মিডিয়ার মিথ্যাচার ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা। যারা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আছেন তারা বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু আজ ২০২৫ সালে হেযবুত তওহীদের অবস্থান অতীতের যে কোনো সময় থেকে ভিন্ন। এখন আমাদের কাজ করতে কোথাও কোনো বাধা নেই বরং যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই আমাদের সাধুবাদ দেওয়া হচ্ছে, সকলের সমর্থন পাচ্ছি। মহান আল্লাহ হেযবুত তওহীদের জন্য এমন একটি উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, মনে হচ্ছে হেযবুত তওহীদ সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছ থেকে আবেদন হারাচ্ছে সেখানে হেযবুত তওহীদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আদর্শিক বক্তব্যগুলো সাধারণ মানুষ আলিঙ্গন করে নিচ্ছে। এটাই 'সুলতানান নাসিরা' বা আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়ের ইঙ্গিত – যখন মানুষ দলে দলে এই দীনে প্রবেশ করবে।

এখন আমরা এমন একটি সময় পার করছি যেখানে প্রতিদিন শত শত মানুষ এই আন্দোলনে প্রবেশ করছে, যোগদান করছে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, মো'মেন হওয়ার জন্য অঙ্গীকার করছে। এই মুহূর্তে যারা খাস মোখলেস মোজাহেদ-মোজাহেদা তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে যারা নতুন যোগদান করছে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, আকিদা পরিষ্কার করা, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া সাংগঠনিকভাবেও অনেক কাজ রয়েছে– প্রত্যেকটি শাখাকে সক্রিয় করা, মিডিয়া বালাগ, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ, অনলাইনে ব্যাপকভাবে মাননীয় এমামের বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সর্বোপরি আল্লাহর খেলাফত করার জন্য যেসব যোগ্যতা অর্জন করা দরকার সবটাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য। ঠিক এই সময়ে ব্যাপক কাজের পরিসরে আন্দোলনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যারা মতানৈক্য, মতবিরোধ, তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত আছে তাদের আল্লাহর কাছে কঠিন জবাব দিতে হবে।

আমি মাননীয় এমামকে খুব কাছ থেকে দেখেছি তিনি এমন একটি মুহূর্ত নেই যা তিনি অলসভাবে পার করেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে কাটাতে হচ্ছে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। মাননীয় এমাম যে গতিতে আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর গতির সাথে তাল মেলাতে পারবে না তারা হয় পিছিয়ে যাবে অথবা একটা সময় আন্দোলন থেকেই ছিটকে পড়বে। যারা কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করে, এমামুয্যামানের নির্ধারণ করা কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, হেযবুত তওহীদ হাদীস মানে কি মানে না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকে ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে; তারা অন্তত হেযবুত তওহীদের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে, গতিশীলতা সাথে তাল মেলাতে পারছেন না। বলা হয়, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। যেখানে মাননীয় এমাম প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছেন দিন-রাত একাকার করে কাজ করে যেতে, একটা দুর্বার ঝাঁপ দিতে সেখানে তারা আন্দোলনের মৌলিক বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা করার সময় কোথায় পায়, আমার বুঝে আসে না।

হেযবুত তওহীদ আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি ছোট্ট সংগঠন থেকে জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে যে কেউ স্বেচ্ছায় আসবে, আকিদা পরিষ্কার হলে

জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে কাজ করবে, মনের মধ্যে খটকা লাগলে চলে যাবে। কেউ বাধা দিবে না। বর্তমানে আধুনিক যুগ, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, উন্মুক্ত প্লাটফর্ম। যে কেউ তার মত প্রকাশ করার অধিকার রাখে। হেযবুত তওহীদ সম্পর্কেও বহু মিথ্যাচার, অপপ্রচার ও জালিয়াতির ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং এই আন্দোলনকে নিয়ে সবার মাঝে যেমন কৌতুহল তৈরি হবে, আলোচনা হবে তেমনি সমালোচনাও হবে। সমালোচনাকারীরা যদি যৌক্তিকভাবে কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চায় তাহলে মাননীয় এমাম বলে দিয়েছেন তাঁর কাছে লিখিতভাবে জানাতে। তিনি সেটা আমলে নিবেন বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিবেন। কিন্তু তা না করে কেউ যদি আন্দোলনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার উন্মুক্ত প্লাটফর্ম ব্যবহার করে তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করে তাহলে তাদের ব্যাপারেও আন্দোলন তেমন কঠোর পদক্ষেপ নিবে না। শুধু নীতিগত সিদ্ধান্ত যা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের উপেক্ষা করা, কোনোরকম তর্ক-বিতর্কে না জড়ানো। সর্বোপরি, মহামান্য এমামুয্যামান সর্বশেষ নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন 'ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য'র সমন্বয়ে বজ্রশক্তির চরিত্র অর্জন করার জন্য। তিনি তাঁর আসমাউ ওয়া আত্তাবেয়্যু বইয়ে পাঁচ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যায় যা বলেছেন আমি হুবহু কয়েকটি লাইন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

> *"বিশ্বনবী (সা.) রেগে লাল হয়ে যেতেন কখন? যখন তিনি দেখতেন কেউ কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করছে। তিনি (সা.) বলেন, কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করা কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের ওপর অবতীর্ণ কেতাবগুলির অর্থ নিয়ে মতবিরোধের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি আরও বললেন, কোর'আনের যে অংশ পরিষ্কার বোঝা যায় এবং ঐকমত্য আছে তা বল, যেগুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (হাদিস, আব্দাল্লাদাহ বিন আমর থেকে মুসলিম)। অর্থাৎ এক কথায় মতভেদ, মতানৈক্য যে সৃষ্টি করবে সে কুফরী করবে অর্থাৎ কাফের হয়ে গেল। কাফের হলে আর রইলো কী? তার সমস্ত আমল তো অর্থহীন এবং তার পরিণাম জাহান্নাম। কাজেই তোমরা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদারা, যারা দীন প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহকে বিজয়ী করতে চাও তারা কখনো কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ করবে না। আন্দোলন যে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিমত দিবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মতবিরোধ করবে না।"*

(আসমাউ ওয়া আত্তাবেয়্যু বই, পৃষ্ঠা নং ১১-১৩)

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্য-সদস্যাদের আরেকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই– রসুল (সা.) বর্ণিত যে পাঁচ দফা কর্মসূচিতে অঙ্গীকার করে আমরা হেযবুত তওহীদ আন্দোলনে এসেছি; সেখানে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, "যে বা যারা ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হেযরত ও জেহাদ- এই পাঁচটি কর্মবন্ধনী থেকে এক বিঘত সরে যাবে তারা তাদের গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে যাবে এবং তারা যতই নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক, নিজেদের পাক্কা মুসলমান দাবি করলেও জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে।" এমামুয্যামান আরও বলেছেন, ইসলাম একটি দেহের ন্যায়। এর ব্রেইন হচ্ছে আকিদা, সালাহ হলো কঙ্কাল, জেহাদ রক্ত চলাচল। কেউ যদি জেহাদ ত্যাগ করে তাহলে তার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, একটা পর্যায়ে মারা যায়। মৃত লাশের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন কারও কোনো কাজে আসে না তেমনি সে ব্যক্তি ইসলামেরও কোনো কাজে আসে না। অর্থাৎ জেহাদ ত্যাগ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ইসলাম থেকেই বহিষ্কার হয়ে যায়।

তাই, হেযবুত তওহীদের সম্মানিত ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ, বর্তমান সময়কে অনুধাবন করে আমাদের উচিত মাননীয় এমামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা। ৫ আগস্টের পর হেযবুত তওহীদ অনন্য উচ্চতায় উঠে গেছে। ইনশাল্লাহ অচিরেই আমরা বজয় দেখতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন, সাবের রাখুন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত এই আন্দোলনে অটল রাখুন।

দেখা থেকে লেখা

ঢাকায় ঈদুল আজহার জামাতে একদিন

কাজী আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ

পবিত্র ঈদুল ফিতরের মত ঈদুল আজহায়ও ঢাকার উত্তরায় ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়। পত্রিকা বালাগ কর্মসূচির সঙ্গে এই ঈদ জামাত আমাদের ঈদ আনন্দকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। জামাতে যোগ দিতে ঈদের দিন ভোর সাড়ে চারটায় আমি ঘুম থেকে উঠে পড়ি। ছিলাম বাসবোতে, সেখান থেকে গন্তব্য উত্তরা। পৌঁছালাম সকাল সাড়ে ছয়টায়। মাঠে উপস্থিত হওয়ার পরই দেখলাম অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঈদগাহ সাজানো-গোছানো হয়েছে। শৃঙ্খলায় নিযুক্ত ভাই ও বোনেরা নারী, পুরুষ, শিশুদের আলাদা আলাদা সারি করে ঈদগাহে প্রবেশ করাচ্ছিলেন। নিরাপত্তায় থাকা দায়িত্বশীলরা সবাইকে ভালোমতো তল্লাশি করে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছিলেন। আমি লাইন দিয়ে ভেতরে ঢুকার সময় আমাকেও একজন নিরাপত্তাকর্মী বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনার ব্যাগে কী আছে জানতে পারি?" আমি ব্যাগ খুলে দেখালাম, এক আত্মীয়ের জন্য উপহার ছিল। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "ঠিক আছে, যান।" নিরাপত্তা বজায় থাকল সেই সাথে তাদের আন্তরিক ব্যবহার। ময়দানের ভেতরে প্রবেশ করেও লাইন ভঙ্গ হলো না। আমি ভিতরে ঢুকে আমার জুতাগুলো কোথায় রাখব খুঁজছিলাম। তখন দেখলাম আমাদের আরেকজন ভাই সেখানে দায়িত্বপালন করছেন। তিনি সবার জুতাগুলো সুন্দর করে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখছিলেন। আমাকে দেখে আমার জুতাগুলোও তিনি রাখার জায়গা করে দিলেন। মনে মনে ভাবলাম এটাই একমাত্র ঈদ জামাত যেখানে কোন মুসল্লিকে ঈদের দিন জামাতে এসে জুতা চুরির ভয়ে থাকতে হবে না। এটা একমাত্র হেযবুত তওহীদের জামাতেই সম্ভব।

ঢাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। ঈদের দিনও বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তৃপক্ষ পুরো ঈদগাহ ময়দানজুড়ে ত্রিপলযুক্ত প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করেছেন। ভেতরে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম ভাইদের পাশাপাশি আমাদের বোনেরাও এসেছে ঈদের জামাতে অংশ নিতে। তাদের দেখে আমি ক্ষণিকের জন্য চলে গেলাম মদীনায় রসুলাল্লাহর করা সেই ঈদ জামাতগুলোতে যেখানে মেয়েরা সমানভাবে জামাতে অংশ নিতে পারত। কিন্তু আজ আমাদের সমাজে ধর্মের নামেই নারীদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পর

হেযবুত তওহীদ আবারও নারীদের ঈদের জামাতে অংশগ্রহণের রেওয়াজ শুরু করেছে। যা দেখে মনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ইসলামের একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। সূর্যের আলো ফোটার পর থেকেই একটু ভ্যাপসা গরম লাগছিল। প্যান্ডেলের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় ফ্যান বসানো থাকলেও পরিবেশ তাতে ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। তাই বলে ফ্যানের বাতাসের প্রত্যাশায় কাউকেই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে ফ্যানের কাছে বসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলাম না। বরং সবাই এক একটি কাতার শেষ হলে অন্য আরেকটি নতুন কাতার তৈরি করে সুশৃঙ্খলভাবে বসছিলেন।

তো সালাহ কায়েমের সময় হলে দেখা গেল অধিকাংশ মুসল্লিই মুসাল্লা নিয়ে আসেন নি। কিন্তু তাতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। কারণ মাটিতে বিছানো ত্রিপলেও কোনো ধূলাবালি ছিল না। আমি একটি কাতারের ডান কর্নারে গিয়ে বসলাম। বসার সময় মনে হলো– আমার পা ভাঙা নিচে বসে থাকতে কষ্ট হবে। তাই আশপাশে তাকিয়ে একজন শৃঙ্খলা কর্মীকে বললাম, "ভাইজান, আমার পায়ে একটু সমস্যা, একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করা যায় কি?" তিনি মুচকি হেসে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি ব্যবস্থা করছি।" কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে একটি সাদা পরিষ্কার চেয়ার দেওয়া হলো। আমি এক কর্নারে বসে ঈদের খুতবা শুনতে থাকলাম। খুতবা দিচ্ছিলেন ঢাকা মহানগর হেযবুত তওহীদের সভাপতি ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ আমির। আমিরের আলোচনা শুনতে শুনতে খেয়াল করলাম, আগত শিশুরা প্যান্ডেলের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করছে। কিন্তু কোনো শৃঙ্খলা কর্মীই তাদের থামানোর চেষ্টা করছেন না। আবার শিশুরাও এমনভাবে দৌড়াদৌড়ি করছিল কিন্তু কেউ তাতে বিরক্ত বোধ করছে না। বিষয়টা আমার কাছে ভালোই লাগলো। ঈদের দিন শিশুরা ঈদগাহ ময়দানে আনন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক।

ঈদের সালাহ কায়েমের সময় উপস্থিত হলে আমির সালাতের নিয়মগুলো খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি সকলকে লাইন সোজা করতে বললেন। এখানে তিনি তিনটি বিষয় গুরুত্ব দিলেন– ধনুকের ছিলার মত কাতার সোজা করা, দু'জন মুসল্লির ডান-বামের গ্যাপ যেন সমান থাকে এবং সকলের উঠবস যেন একসাথে হয়। এরপর সবাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সালাহর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাহ শুরু হলো এবং ছয় তাকবির মেনে শেষ হলো। একটা আলাদা প্রশান্তি অনুভব করলাম। সালাম ফেরানোর পর কেউ তাড়াহুড়ো করে উঠে গেল না বরং মোনাজাতের অপেক্ষায় যে যেখানে সালাহ আদায় করেছে সেখানেই শৃঙ্খলার সাথে বসে রইলো। আমির যখন মোনাজাত শেষে উঠে দাঁড়ালেন তখন মুসল্লিরা সবাই উঠে দাঁড়াল। সুশৃঙ্খলভাবে বসা মুসল্লিদের দেখে তখন আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। কারণ সর্বত্র একটা শৃঙ্খলা, একটা স্থিরতা যেন ছেয়ে ছিল।

→ মোনাজাত শেষ করার পর বাহিরে এসে এক গভীর আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পেলাম। হেযবুত তওহীদের সকল সদস্য-সদস্যারা একে অপরের সাথে আলিঙ্গণ করছে, 'ঈদ মোবারক' বলে কোলাকুলি করছে। যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। এত হাজার হাজার মুসুল্লী ভেতরে প্রবেশ করেছে কিন্তু কারও কিছু হারায় নি। এটা ছিল জামাতের সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়। যেখানে বাইরের জামাতগুলোতে সামান্য জুতা জোড়াও খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে হেযবুত তওহীদের ঈদের জামাতে সবাই নির্ভয়ে চলছিল। এটাই হেযবুত তওহীদ এবং অন্যদের মধ্যে তফাত।

মাঠের পাশেই ছিল সারি সারি টেবিলের ওপর সাজানো বিভিন্ন রকম পসরা। কিন্তু সেখানেও ছিল না ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা। বাচ্চাদের খেলনা, বাহারি রকম খাবার, আসবাবপত্র নিয়ে সাজানো এসব স্টল। পরিশেষে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রস্থান করি সেখান থেকে। এমন উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে কখনো ঈদের সালাহ আদায় করতে পারবো ভাবি নি। কিন্তু মহান রব্বুল আলামিনের দয়ায় আমরা হেযবুত তওহীদ ধীরে ধীরে আমাদের বিজয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে সফলভাবে এগিয়ে চলেছি। ঈদের জামাতে প্রকাশ্যে সালাত আদায় তার অন্যতম উদাহরণ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করি যে, আগামী ঈদে যেন আমরা লক্ষাধিক সদস্যদের নিয়ে ঈদের জামাত আদায় করতে পারি ইনশাল্লাহ। আমিন।

মানতের ফল

মানতের পর খুঁজে পেলাম মানিব্যাগ

আমি সোহানুর রহমান হিমসেল। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলা আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কিছুদিন আগে আমি আমার অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে ঢাকা যাই। একদিন সন্ধ্যা বেলায় রাস্তায় বের হয়ে দোকান থেকে খাবার কিনতে যাবো, ঠিক সেই সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আমার মানিব্যাগ নেই। মানিব্যাগে দুই হাজার পাঁচশত টাকা ছিল।

যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছিলাম, সেই রাস্তায় দু'বার করে খুঁজেও মানিব্যাগ পাই না। পরে পাঁচতলা বাসায় উঠি ফোনটা নেওয়ার জন্য যাতে ফোনের আলোয় আবার খুঁজে দেখতে পারি। সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই আমি মনে মনে মানতের কথা ভাবতে থাকি। মানিব্যাগ হারানোর কথা বাসায় এসে বলার পর আমার স্ত্রীও আমাকে মানত করতে বলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত টাকা মানত করি। তারপর আবার সেই আগের জায়গায় গিয়ে মানিব্যাগ খুঁজতে থাকি। আর পরক্ষণেই অবিশ্বাস্যভাবে আমার মানিব্যাগটি খুঁজে পাই। আলহামদুলিল্লাহ। ঢাকার মতো ব্যস্ত শহরের রাস্তায় যেখানে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ চলাচল করে সেখানে মানিব্যাগ খুঁজে পাওয়া সত্যিই স্বপ্নের মতো। আমার বিশ্বাস এই ঘটনা শুধুই মানতের ফল।

ফিরে এলো চুরি যাওয়া ৩৫ হাজার টাকা

আমি রোজিনা আক্তার, ময়মনসিংহ বিভাগীয় নারী সম্পাদক। কিছুদিন আগে আমার চাচা ব্যাংক থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাসায় বিছানার নিচে রেখে দেন। এরপর সন্ধ্যায় তিনি চাকরির উদ্দেশ্যে ঢাকায় যান। চাচি মনের ভুলে টাকাগুলো বিছানার নিচ থেকে সরাতে ভুলে যান। রাত দুইটার সময় দরজা খুলে বাইরে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় তিনি দেখতে পান- একজন লোক মুখ গামছা দিয়ে ঢেকে ঘর থেকে বের হচ্ছে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত তার ছেলে ওয়াশরুমে যাচ্ছে। কিন্তু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন- লোকটি তার ছেলে নয়, বরং অন্য কেউ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পেরে চিৎকার করতে শুরু করেন এবং দেখতে পান বিছানাপত্র ওলট-পালট। আর বিছানার নিচে রাখা টাকাগুলোও নেই। চাচির চিৎকার শুনে লোকটি পালিয়ে যায়। তিনি কয়েকটি বাড়ি পেরিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন। এসে আমার বাবাকে ডেকে তোলেন এবং বিস্তারিত ঘটনা বলেন। আমার বাবা-মাসহ আশপাশের অনেকেই মিলে লোকটিকে খোঁজার চেষ্টা করেন কিন্তু ততক্ষণে সে উধাও। ঘরে ফিরে গিয়ে সবাই নিশ্চিত হন যে টাকাগুলো সত্যিই চুরি হয়ে গেছে। এতে মন খারাপ করে আমার বাবা আমাকে ফোন করেন। আমিও শুনে খুব কষ্ট পাই। আমার চাচার সাথেও ফোনে কথা হয়, তিনিও হতাশ হয়ে পড়েছেন। কেননা টাকাটা ঋণের ছিল। কেউ ভাবতেই পারেনি এইভাবে টাকাগুলো হারিয়ে যাবে। সবাই যখন আফসোস করছিল তখন আমার মনে হলো শেষ চেষ্টার জন্য আর একটা পথই আছে। সেটা হলো আল্লাহর রাস্তায় মানত করা।

আমার চাচা যেহেতু তাগুত। তাই তাকে কিছু না বলে আমি চাচিকে ফোন করে বলি- তিনি যেন খাস নিয়তে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে মানত করেন। তিনি আমার কথা মতো তাই করেন। আমিও আল্লাহর কাছে একটি মানত করি। মনে মনে ভাবি- যদি এমন হত যে সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি টাকাগুলো আগের জায়গাতেই পাওয়া গেছে! এই ভাবনা নিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল সাতটার দিকে ঘুম ভাঙে। আমি বারান্দায় যাওয়া মাত্রই ফোনে একটি কল আসে। দৌড়ে এসে ফোন রিসিভ করতেই শুনি- টাকাগুলো আগের জায়গাতেই পাওয়া গেছে! সাথে সাথে আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। পরিবারের সবাইকে ফোন দিয়ে জানাই। মানতের এই আশ্চর্যজনক ফল দেখে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। এরপর বারবার আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করি।

অসুস্থ গাভীর সুস্থতা ও সন্তান প্রসব

আলমগীর হোসেন: নোয়াখালীতে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর মধ্যে 'মেকদাদ এন্ড মেহরাদ এগ্রো' ফার্ম আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এখানে অনেক জাতের গাভী রয়েছে। একদিন এদের মধ্যে একটি গাভীর বাচ্চা প্রসব করার সময় হলে কিছু শারীরিক জটিলতার কারণে গাভীটি বাচ্চা প্রসব করতে পারছিল না। এখানে অনেক অভিজ্ঞ লোকেরা চেষ্টা করছিল গাভীটির বাচ্চা প্রসব করানোর জন্য। কিন্তু তাতেও আমরা সকলেই ব্যর্থ হই। এতে ফার্মের সবাই খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। কারণ গাভীটি আমাদের ফার্মের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নিজামউদ্দীন আমির তখন নোয়াখালীতেই ছিলেন। তিনি যখন গাভীর এই দুরাবস্থার কথা জানতে পারেন তাৎক্ষণিক সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি এসেই গাভীর এই দুরবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানত করে ফেলেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই মানত করার ১০-১৫ মিনিট পরই গাভীটি সুস্থভাবে বাচ্চা প্রসব করে। যে শারীরিক জটিলতার কারণে সে দীর্ঘসময় ধরে বাচ্চা প্রসব করতে পারছিল না তা মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়। এই অলৌকিক ঘটনার পর আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে যাই এবং আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। তখন আমরা মানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

ঘাম ঝরানোর বিকল্প নেই

মাহবুব আলম নিক্কন

লেখার শুরুতেই হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে আমরা হেযবুত তওহীদ যে মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলাম সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত অবশেষে আসতে চলেছে। আমরা হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্যরা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় বুকে ধারণ করে প্রতিটা দিন পার করি। আমরাও উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটির মতো মৃত্যুভয়হীন, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমরা তাদেরই উত্তরসূরী। এতদিন পত্রিকা বালাগ, সভা-সেমিনার, মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে আমরা আন্দোলনের বালাগ কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। তবে আমরা জানি, বালাগ দীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয়। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কেতাল অপরিহার্য। আর সেই কেতাল বাস্তবায়নের জন্য জাতিগতভাবে প্রশিক্ষিত হওয়ার বিকল্প নেই। কাজেই এখন সময় এসেছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করার।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ অক্টোবর মাননীয় এমামের নির্দেশে চাষীরহাটে আমাদের প্রশিক্ষণ বিভাগের যাত্রা শুরু করি। একটি সুস্থ, সবল, দেশপ্রেমিক ও মুত্তাকি মো'মেন-মোজাহেদ জাতি গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। যাতে দেশের যেকোনো সংকটকালে আমরা সাহসিকতার সাথে ভূমিকা রাখতে পারি এবং যেকোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে পারি। প্রশিক্ষণের শুরুর দিকে দেখা যায়, অনেক ভাইবোন দৌড় বা অন্যান্য শারীরিক প্রশিক্ষণে খুব দুর্বল ছিলেন। ৫-১০ মিনিট দৌড়াতে গিয়েই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। হাঁটতেও পারতেন না দীর্ঘক্ষণ। তবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ফলে তারা ধীরে ধীরে এসব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শারীরিক কৌশল রপ্ত করেন। এখন তারা ১-২ ঘণ্টা পর্যন্ত দৌড়ানোর সক্ষমতা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে, ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় মাত্র এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণে অনেকেই এ সামর্থ্য অর্জন করেছেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যারা একেবারেই প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম ছিলেন না, তারাও প্রশিক্ষণের ফলে নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারছেন। অল্প কয়েকদিনের প্রচেষ্টাতেই অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। অনেকের শারীরিক সমস্যা দূর হয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলা মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখে। এর ফলে দেহ হয় সুসংগঠিত, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ মানুষকে বাজে চিন্তা থেকে দূরে রাখে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের দিকে নিয়ে আসে। তাই আমরা আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধু নোয়াখালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি নি। বরং সারা বাংলাদেশব্যাপী কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতোমধ্যেই ঢাকা বিভাগ ও কুষ্টিয়ায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। ময়মনসিংহ বিভাগে, ঢাকা বিভাগে এখনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। আমরা প্রশিক্ষণগুলো এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা দুই মাস মেয়াদে প্রদান করছি। স্থায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থাপনা। ওয়ার্মআপ, ডায়নামিক ওয়ার্মআপ, দৌড়, ওয়েট ট্রেনিং এবং অন্যান্য সরঞ্জামসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এ প্রশিক্ষণের অংশ। যেহেতু এ প্রশিক্ষণ আল্লাহর নির্দেশিত দীন প্রতিষ্ঠার অংশ সেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার থেকেও বহুগুণে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দান করছেন। প্রশিক্ষণার্থীরাও বুঝতে পারেন না কবে তাদের মধ্যে এত উন্নতি ঘটেছে!

শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমাদের ট্রেনিং সেশনগুলোতে আমরা আন্দোলনের আকিদাগত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অংশও রেখেছি। আকিদা ক্লাসগুলোতে সরাসরি মাননীয় এমাম, নিজাম আমির (সমন্বয়কারী), শ্রদ্ধেয় রাকিব আল হাসান স্যার, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন আমিররা এ ক্লাসগুলো নিচ্ছেন। ফলে যারা একসময় শাখায় নিষ্ক্রিয় ছিল প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ তারা শাখার প্রাণ। তাদের ত্যাগ, এমাম-আমিরের আনুগত্য ও সংগ্রামের মানসিকতা আন্দোলনের জন্য এক অনন্য সম্পদে রূপ নিয়েছে। তারা এখন শত্রুর বুকে ত্রাস সৃষ্টিকারী সাহসী মোজাহেদ। তারা শাহাদাতের জন্য লালায়িত ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত মোজাহেদে রূপ নিয়েছে।

রংপুরের ছিদামহাটে সন্ত্রাসী হামলার সময় আমাদের প্রশিক্ষিত সদস্যদের সাহসিকতাই প্রমাণ করেছে প্রশিক্ষণ কতটা জরুরী। মুহূর্মুহু সন্ত্রাসী আক্রমণের মুখেও তারা হতাশ হয়নি, সাহস হারায়নি। অন্যান্যদের তুলনায় তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তারা ছিল অটুট এক শক্ত প্রতিরোধের প্রাচীর। তারা নিজেরা সাহসী ছিল এবং অন্যদের মনোবল ধরে রেখেছিল। এভাবেই প্রশিক্ষণ বিভাগ গড়ে তুলেছে এক সাহসী, উদ্যমী ও দক্ষ মোজাহেদের দল। শুধু সাহসী মোজাহেদই নয় ভবিষ্যতে নেতৃত্বদানের যোগ্যতাসম্পন্ন মো'মেনও এখান থেকে গড়ে উঠছে। একসময় যারা নিষ্ক্রিয় ছিল তারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে দাপ্তরিক দায়িত্বসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করছেন। আগামীর বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করার এটাই মোক্ষম সময়। অতএব, আমরা আহ্বান জানাই সকল শাখার দায়িত্বশীল ও সদস্যবৃন্দ যেন নতুন সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলার প্রতি আন্তরিক হন।

মাহাবুবুল আলম নিক্কন

বি.পি.এড., এম.এ.

অভিজ্ঞতা:

- লেভেল ওয়ান ক্রিকেট কোচ, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
- হ্যান্ডবল কোচ, বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
- ক্রিকেট কোচ, ফরিদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা
- প্রতিষ্ঠাতা ও কোচ, ফরিদপুর ক্রিকেট স্কুল
- ফিটনেস ট্রেনিং কোচ, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
- দীর্ঘ ৩০ বছর ক্রিকেট সংশ্লিষ্টতা এবং জেলা ক্রিকেট টিমের খেলোয়াড়
- স্কাউট লিডার ট্রেনার, ব্র্যাকের নারী ক্রিকেট ও ফুটবল প্রশিক্ষক
- ঢাকা ক্রিকেট লিগে ১৬-১৭ বছর সময়কালে মোট ১৩টি দলে অংশগ্রহণ
- বর্তমানে বিভিন্ন বড় লিগে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন

দ্য সেভিয়ার
রিয়াদুল হাসান

দিশেহারা সময়ের বুকে পাতো কান
ত্রাহী সুরে কাঁদে কারা, চায় পরিত্রাণ?
বোমার শব্দে কাঁপে মায়ের হৃদয়,
মৃত শিশুদের লাশ গুনছে সময়।

ধর্ষিতা নারী ঢাকে লজ্জায় মুখ,
রক্তে ভাসছে সারা পৃথিবীর বুক।
আসমানে হাত তুলে কাঁদে মানবতা,
আল্লাহ পাঠাও কোনো ত্রাণকর্তা।

যে নেতার আহ্বানে আর্ত জীবন
যুদ্ধে নামবে ছিঁড়ে সকল বাঁধন।
যার প্রেরণায় হয়ে সীসার প্রাচীর,
সুরক্ষা দেবে সারা মানবজাতির।

যে নেতার গর্জনে ভীত দাজ্জাল
যার হাতে স্রষ্টার ন্যায়ের মশাল।
যার তর্জনি পথ দেখাবে সঠিক
এক উম্মাহর এক নেতা নির্ভীক।

সে নেতার পথ চেয়ে মানবজাতি
প্রার্থনা করে তারা, করে মিনতি।
দীন কায়েমের কথা বলবেন তিনি,
গড়ে তুলবেন সেরা সেনাবাহিনী।

চারিদিকে মিথ্যার ভীম কারাগার,
তাঁর করাঘাতে ভেঙে হবে চুরমার।
আল্লাহর মনোনীত জাতির এমাম
বিশ্বজাহান তাঁকে জানায় সালাম।

হে নেতা !!
মুস্তাফিজ শিহাব

যখন মুষ্টিবদ্ধ হাতেরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়,
তখন চূর্ণ করে বদ্ধদুয়ার আনে বরাভয়।
হে মানুষ, চারিদিকে দেখো আলো ফুটেছে,
ঐ, ন্যায়ের মশাল হাতে মহান নেতা এসেছে।

তাঁর, বজ্রকণ্ঠের প্রবল নিনাদ,
ওই শোনা যায় হায়দারি হাক,
যেন, নিঃশ্বাসে তাঁর ধ্বংস বিষাণ,
বিভেদ-ক্লেদের হোক অবসান।

হে নেতা, মহাপ্রাণ এসেছেন নতুন যুগ নিয়ে,
এক লৌহ দৃঢ় সংকল্পের বারতা দিয়ে।

এই আঁধার রাতের দুঃখ থেকে বাঁচাও ধরনী,
তোমার শুভ্র হাসির দীপ্তি তেজে রৌদ্রবসনী।
হে মহান, তুমি আমাদেরই আশার শেষ প্রদীপ,
তাই, তোমার স্বপ্নগুলো ধারণ করে
ছুটছি দিগ্বিদিক।

প্রকৃত ইসলাম

রাকীব আল হাসান

হেদায়া তোমার হারিয়ে গিয়েছে
যুগ বহু যুগ আগে
শুনিয়া আমার এই কথা তুমি
লাল হয়ে গেলে রাগে।

বিকৃত আজ হয়েছে তোমার
ধর্ম অনেক খানি
পাপাচারে তাই ডুবে গেছে সব
জানি তাহা আমি জানি।
গোস্বা করো না, এইবার থামো
খাটাও তোমার মাথা।
যুক্তি-বুদ্ধি, বিবেক খাটিয়ে
রায় দেবে শেষে যথা।

তুমিই বলিছ, সময় হয়েছে
মাহদির আসিবার।
হেদায়ার পথে যদি থাকি মোরা
তাঁর কেন দরকার?

এইবার বলো- 'ইসলাম' মানে
যদি বা শান্তি হয়,
ফল দেখে মোরা নির্ণয় করি
বৃক্ষের পরিচয়।

ইসলাম যদি গাছ হয় তবে
শান্তি তাহার ফল।
আজ কেন তবে মুসলমানের
আঁখি করে টলমল?

সত্যিকারের ইসলাম যদি
থাকিত অবনী পরে
মাথা উঁচু করে থাকিতে তোমরা
অন্যরা হাঁটু গেড়ে।
তোমরা হইতে শ্রেষ্ঠ জাতি
কোরান যেমন কয়।
আদেশ নিষেধ তোমরা করিতে
তোমরা করিতে জয়।

ঐক্যবদ্ধ থাকিত সকল
মুসলিম ভাই-বোন
এক জাতি হয়ে এক নেতাকেই
মানিত সকল জন।

সকল মতের সকল পথের
কবর রচনা করে।
আলেম সমাজ এক হয়ে যেত
দুই হাতে হাত ধরে।

ঝগড়া-ফ্যাসাদ ঘুচিত সকল
থাকিত রহম-দিল।
এক পরিবার হয়ে একসাথে
চলতো, থাকিত মিল।

আলেম সমাজ করিত সবার
যুদ্ধের আহ্বান
নিজেও থাকিত সবার সামনে
নিয়ে তরবারিখান।

রাষ্ট্র চলিত খোদার বিধানে
ন্যায়ের দন্ড ধরে।
অপরাধী সব ভালো হয়ে যেত
দন্ড পাওয়ার পরে।

এখন বলোতো সেই ইসলাম
আছে কি যা ছিল আগে?
সত্যিকারের মুসলিম কিনা
এমন প্রশ্ন জাগে?

সত্যিকারের মুমিনের সাথে
খোদার দিদার হয়।
যুদ্ধে গেলেই সেই মুমিনের
বিজয় সুনিশ্চয়।

আল্লাহ দিবেন খেলাফত তার
দিছেন অঙ্গীকার।
আখিরাতে পাবে জান্নাত আর
এটাই বিধান তার।

যদি হতে চাও সেই মুমিনিন
ঈমান আনতে তবে।
জান ও মালের সবটুকু দিয়ে
জেহাদ করতে হবে।

জাগো তরুণ, জাগো মানবতা!

রিমন

হে তরুণ প্রাতের দল,
তোমাদের চোখে ছিল যে স্বপ্নের আলো,
সেই আলো কি নিভে গেছে আজ?
চারদিক আজ আগুনে ঘেরা,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে বারুদের গন্ধ।
পৃথিবী কাঁদে, সভ্যতা চিৎকার করে
কিন্তু কোথায় তোমাদের পদধ্বনি?

এই কি সেই যুগের উত্তরাধিকারীরা,
যারা ইতিহাসে বিপ্লব গড়েছে,
প্রলয়ের মাঝে আশার বীজ বুনেছে?
আজ কি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে স্বপ্নের ভেতরে,
নাকি ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে?

তোমাদের হাতেই ছিল প্রতিশ্রুতি–
ভবিষ্যতের, সত্যের, ন্যায়ের।
আজ সেই হাত কি নীরব?
সেই কণ্ঠ কি নিঃশব্দ?

মুক্তির শপথ

মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

এসেছে রুদ্র করিবো যুদ্ধ,
জীবনের সব চাওয়া করে অবরুদ্ধ।
ভয়হীন নির্ভীক চলেছি যে শশ্মানে,
মৃত্যুর যমদূত বল তুই কোনখানে?
এই মন এই প্রাণ খুঁজে খুঁজে হয়রান,
কোন কুরুক্ষেত্রে জীবন হবে বলিদান।

পেয়েছি যে মুক্তির পয়গাম,
আজ থেকে চলবে জীবনের সংগ্রাম।
মজলুমের মাটিতে নিপীড়নের ঘাঁটিতে,
জালিমের কারাগার ভেঙে দেবো লাথিতে।
আল্লাহ রসুলের রাখিতে সম্মান,
কতশত সাহাবী হয়ে গেছে কোরবান।

আকাশ মাটির তল খুঁজেছি অবিচল,
জ্ঞানের হিমালয় পর্বত হয়ে গেছে হিমাচল।
ছুপছুপ রক্ত বিধাতার মাটিতে,
অন্যায়-অশান্তি মুছে সংগ্রামের গতিতে।
রক্তের ছাপে রঞ্জিত আজ রণাঙ্গন,
জ্ঞানীদের মুখোশ তবে হবেই উন্মোচন।

আশাহীন ব্যর্থ মানুষেরই স্বার্থ,
লেবাসধারী চায় খেতে রুটি আর গোস্ত।
কতদিন খাবিরে টাইটেল নামধারীরে,
একদিন যাবি তুই মাটির নিশ্চিত কবরে।
মুরশিদ নামে ধরেছিস ইবলিশ আবাল,
সেইদিন কি হবে হাল, কে ধরিবে তোর পাল?

যদি চাস হতে তুই রাসুলের উম্মত,
তরিকার দোহাই ছেড়ে ধর তওহীদের সুপথ।
চেয়ে দেখ আকাশে ধোঁয়ার রাশি,
ধ্বংসের খেলাতে মেতেছে যে বিশ্ববাসী।
সমাজের কার্যে চলে নৈরাজ্য,
ঐক্যের পৃথিবী কতশত ভাগে বিভাজ্য?

হরহামেশাই বল একতাই সম্বল,
নইলে পৃথিবীতে খেতে হবে চপ্পল।
আল্লাহর লানত ছেড়ে ঐ বক্রপথ,
কালেমায় তওহীদে তুই করে নে শপথ।
মুক্তির কথা বল যুক্তির চাদরে,
সংগ্রামের জীবন তোর নাই সুখ আদরে।

যার আহ্বানে দীন গ্রহণ করেছেন হাজারও নারী-পুরুষ

সুমাইয়া ইসলাম আন্দোলনে যোগদান করেন ২০০৬ সালে। আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে শুরু হয় তীব্র বিরোধিতা। হেযবুত তওহীদে যোগ দেওয়ার কারণে তার বাবা তাকে ত্যাজ্য করার হুমকি দেন। শ্বশুরবাড়িতে পান থেকে চুন খসলেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। তবে কোনো প্রতিকূলতাই তার অন্তরের ঈমানের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারেনি। বরং প্রতিটি বাধা তাকে আরও দৃঢ় করেছে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থায়। তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন আন্দোলনের কার্যক্রমকে এবং অবিচল নিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। হেযবুত তওহীদের 'নারী বিভাগ' প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই কেরানীগঞ্জের নারী সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সুমাইয়া ইসলাম। বর্তমানে তিনি উত্তরার একজন ইউনিট আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্দোলনের সন্ধান

'প্রকৃত ইসলামের ডাক' হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে তিনি হেযবুত তওহীদের সন্ধান পান। হ্যান্ডবিল পড়ার পর তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতুহল অনুভব করেন। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে নানা জিজ্ঞাসা। পড়তে শুরু করেন আন্দোলনের বিভিন্ন বই ও লেখা। নিয়মিত শাখার মিটিংগুলোতে উপস্থিত থাকতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হতে থাকে ইসলামের সঠিক রূপ ও আকিদা। বুঝতে পারেন মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থা থেকে হেজরত করবেন। তখন তিনি মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। কিন্তু বয়সের স্বল্পতা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শুরু করেন পুরোদমে বালাগের কাজ। ইতিহাস পড়ে যখন জানতে পারেন, আল্লাহর রাসুলের (সা.) সময় নারীরা জাতির কল্যাণে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তখন তিনি তেমনই একজন বীরাঙ্গনা হবার স্বপ্ন দেখেন। এরপর পুরোদমে কেরানীগঞ্জের সর্বত্র হেযবুত তওহীদের আদর্শ প্রচারে কাজ করতে শুরু করেন। যদিও প্রথম দিকে পরিবার থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। একে তো পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন আবার আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম দুইদিক একসাথে সামলানো ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। পরিবারের তাগুত সদস্যরা যেন আন্দোলনের কাজ নিয়ে অভিযোগ করতে না পারেন তাই ভোরবেলা উঠেই গৃহস্থালি যাবতীয় কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়তেন বালাগের কাজে। দিনের পর দিন গিয়েছে পরিবারের বাধা ও বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ তার এই ধৈর্যের ফল দেন। আজ তার শ্বশুরবাড়ির সবাই আন্দোলনের সদস্য। তার বাবার বাড়ির শুধু ভাই এবং বাবা ছাড়া বাকি সবাই আন্দোলনের সাথে আছেন। আন্দোলনের কাজের জন্য তাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন তার সন্তান এবং স্বামী মো. রাসেল ভূঁইয়া। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তার স্বামীর স্বপ্ন ছিল তার স্ত্রী যেন কেরানীগঞ্জের প্রথম সারির মোজাহেদা হয়। সেই কথার উপর তিনি আজও অটল আছেন। সুমাইয়া ইসলামকে এগিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়ে পাশে আছেন তার স্বামী।

মাননীয় এমাম যখন নোয়াখালীতে স্টুডেন্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন, তখন সুমাইয়ার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটাপন্ন। চারদিকে ঋণের চাপে জর্জরিত হয়ে সন্তানের লেখাপড়াও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এমামের নির্দেশ বাস্তবায়নে তিনি একটি কঠিন ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। নিজের সন্তানকে পাঠিয়ে দেন নোয়াখালীতে এবং এককভাবে তার সব খরচ জোগাড় করতে থাকেন। অর্থের প্রয়োজন মেটাতে তিনি মাস্ক বিক্রি থেকে শুরু করে নানা ছোটখাটো কাজ করেন। সে সময়টা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায়। তবুও কোনো কষ্টই তাকে দমাতে পারে না। মাত্র ৬ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেন কসমেটিকসের একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা, যা আজ লাভজনক অবস্থানে পৌঁছেছে।

নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা

'নারীরা ইসলামের জন্য কাজ করবে' বর্তমানে এটা ভাবাও যায় না। কিন্তু হেযবুত তওহীদের নারীরা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছে, যার অনন্য উদাহরণ সুমাইয়া ইসলাম। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ২,০০০-এরও বেশি সদস্য হেযবুত

তওহীদের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অনেকে মর্দে মোজাহেদও হয়েছেন। একবার কেরানীগঞ্জ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ঘটেছিল একটি অনন্য অভিজ্ঞতা। সুমাইয়ার কথা শুনে ওসি এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে তাকে 'বোন' বলে সম্বোধন করেন এবং অন্য পুলিশ সদস্যদের কাছেও সেই পরিচয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন সুমাইয়ার টিমকে প্রশাসনিক ব্যক্তিরা বিশেষভাবে সম্মান দেখায় যা আজও তার স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রয়েছে। একবার সুমাইয়া ইসলামদের বাসায় মিটিং হচ্ছিল। এলাকার কিছু মানুষ প্রশাসনকে জানায় এখানে নাকি জঙ্গিদের বৈঠক হচ্ছে। পরে পুলিশ এসে তাদের মিটিংয়ে চড়াও হয় এবং অনেক হয়রানি করে। তার বিয়ের সময় তোলা মহামান্য এমামুযযামানসহ একটি ছবি তারা সেখান থেকে নিয়ে যায়। এত মূল্যবান একটি ছবি হারানোয় তার অনেক মন খারাপ হয়।

এমনই শত শত আনন্দ বেদনার স্মৃতিতে ভরপুর সুমাইয়া ইসলামের জীবন। জীবনে অনেক উত্থান ও পতন রয়েছে। কিন্তু কোন কিছুতেই কখনো ভেঙে পড়েননি তিনি। আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও সবরের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন প্রতিটা বাধা। কখনো কখনো লড়াই লড়াই করেছেন মানুষরূপী ইবলিসদের রুখতে। তার সাহস, কর্মস্পৃহা ও ব্যক্তিত্ব আজ অনুপ্রাণিত করে চলেছে হেযবুত তওহীদের বহু নারীকে ।

সকল নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পারিবারিক ও আর্থিক কারণে আমাদের বোনেরা অনেক সময় আন্দোলনের কাজে পিছিয়ে যায়। এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সংগ্রাম করা অনেক কঠিন। কিন্তু যদি তারা এসব প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবেলা করে ফিল্ডকে বেশি গুরুত্ব দেয় তাহলে আল্লাহর তার জন্য পথ সহজ করে দিবেন। তিনি চান নারীরা তার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে কাজ করুক। সেজন্য তিনি নারীদের হৃদয়ে প্রথমে দায়িত্বশীলের প্রতি ভালোবাসা, মায়া, মমতা জন্মানোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ দায়িত্বশীলকে ভালোবাসলে তার দেওয়া কমান্ডের প্রতিও ভালোবাসা আসবে। রুহামা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য কাজের পাশাপাশি প্রায়ই তিনি বোনেদের নিয়ে ছোটখাটো পিকনিক, চায়ের আড্ডার আয়োজন করেন।

পরিশেষে সুমাইয়া ইসলাম হেযবুত তওহীদের সকল মো'মেন ভাইবোনদের কাছে দোয়া চান। আল্লাহ যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে দীনের উপর অটল রাখেন, কাজ করার সক্ষমতা দেন এবং এবং শাহাদাতের সৌভাগ্য দেন সেজন্য তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন।

সত্যের সংগ্রামে ছাত্র ফোরাম

রাদ উল ইসলাম

ঢাকা মহানগরীতে হেযবুত তওহীদের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে গঠিত একটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংগঠন "তারুণ্য সভা" দীর্ঘদিন আন্দোলনের তরুণ প্রজন্মকে আন্দোলনমুখী ও গতিশীল করে তুলতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তাদের প্রতিটি উদ্যোগের সাথে আমি শুরু থেকেই ছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি মাননীয় এমামের দিকনির্দেশনায় হেযবুত তওহীদের সকল ছাত্রদের নিয়ে আলাদা আরেকটি শাখা তৈরি করা হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে হেযবুত তওহীদ ছাত্র ফোরাম। বর্তমানে আমি এই ফোরামটির দায়িত্ব পালন করছি। মাননীয় এমামের চাওয়া ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক হেযবুত তওহীদের তরুণদের হৃদয়ে জেহাদের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রজন্মের কাছে হেযবুত তওহীদের বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠভাবে আমরা তুলে ধরছি। যেহেতু ছাত্রদের নিয়েই আমার কাজ তাই তাদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রীক বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছাত্রদের সাথে পরিচিত হয়েছি। যেমনঃ ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, ইসলামী ছাত্র শিবির, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশসহ দেশের প্রায় সব ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের সাথে উঠাবসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি ভাগ দেখতে পেয়েছি। যা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রীক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের জানাটা জরুরি। তো সেটাই আজকে সংক্ষেপে তুলে ধরব।

ছাত্রদের মধ্যে একটি শ্রেণি রয়েছে যারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। তারা মূলত নিজেদের ক্যারিয়ার, ভবিষ্যৎ ও সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করে। দেশ, জাতি, সমাজ, ন্যায়-অন্যায় কিংবা সত্য-মিথ্যা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। জনগণের টাকায় পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পরও দেশের প্রতি তাদের মধ্যে কোনো মায়া-মমতা বা দায়বদ্ধতা দেখা যায় না। শিক্ষিত হয়ে দেশের জন্য কিছু করবে বা দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করবে এমন কোনো চিন্তাভাবনাও তাদের নেই। বরং এরা শিক্ষিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। অনেকটা এমন তাদের মানসিকতা। ছাত্রদের মধ্যে আরেকটি বড় অংশ রয়েছে যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছাত্রদের সাধারণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক. যারা সেক্যুলার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দুই. যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। পাঁচ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান বেশ মজবুত ছিল। তখন তারা ইসলামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করত। কিন্তু ৫ই আগস্টের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বর্তমানে ইসলামিক ঘরানার ছাত্রসংগঠনগুলোই সেক্যুলার ছাত্রদলগুলোকে চাপে রেখেছে।

ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলো অনেক সময় নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, যেখানে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ, সেখানে তারা বিভিন্ন ‘নামহীন’ ব্যানারের অধীনে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। অন্যদিকে, সেক্যুলার ছাত্রদলগুলোর মধ্যেও আবার দুইটি ভাগ দেখা যায়। একভাগ ডানপন্থী ও আরেকভাগ বামপন্থী। ডানপন্থীরা তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকলেও বামপন্থীরা ধর্মের ব্যাপারে বেশ কট্টর মনোভাব পোষণ করে। ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ নেই এবং এ বিষয়ে কোনো আলোচনা শুনতেও তারা অনাগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নাস্তিক ছাত্রের সংখ্যা কম নয়।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে যখন আমরা হেযবুত তওহীদের আদর্শ নিয়ে কথা বলতে যাই, তখন জামায়াত-শিবিরপন্থী ছাড়া মোটামুটি সবার কাছেই আমাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়। যখন ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙে দিয়ে ইসলামের প্রকৃত ধারণা তুলে ধরা হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে। তারা অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না; কিন্তু যেকোনো বিষয় যদি যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা যায় তবে সেটা অস্বীকার করে না। এমন একটি সচেতন শ্রেণি রয়েছে, যারা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত নয়। এরা আমাদের সমর্থন করে ও আমাদের আদর্শকে পছন্দ করে।

> **→ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটি অংশ এমন রয়েছে, যারা মাননীয় এমামকে চেনে এবং অন্তত একবার হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্য শুনেছে। এদের মধ্যে চেতনা, জোশ, আবেগ সবই আছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই চেতনাকে বারবার ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বানানো হয়েছে, যার ফলে তাদের আবেগ ও চেতনা বিকৃত হয়ে পড়েছে।**

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংখ্যাটাই বেশি। এরা রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে রাজপথে নামতে দ্বিধা করে না। সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান এই ছাত্ররা। তারা না রাজনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানে, না ধর্ম সম্পর্কে। তাদের মনোভাব অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। তাই কোনো আদর্শ গভীরভাবে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতিও তাদের থাকে না। তবে, এই অস্থির চেতনার মাঝেও যখন তারা কোনো ইস্যুতে উদ্দীপ্ত হয়, তখন তারা প্রাণপণ লড়াই করে। এই ছাত্রদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করার অভিজ্ঞতায় আমার একান্ত উপলব্ধি হচ্ছে, তারা যদি একজন যোগ্য নেতৃত্ব পায়, তবে তারা নিঃসন্দেহে জেগে উঠবে। এদের ভেতরে বাস্তবিক অর্থেই চেতনা আছে, কিন্তু সেই চেতনাকে নবজাগরণের দিকে পরিচালিত করার মতো নেতৃত্ব নাই। তারা হেযবুত তওহীদের অকাট্য বক্তব্য গ্রহণ করার মানসিকতাও রাখে, কারণ তারা ধর্ম বিষয়ে অন্ধ নয়। এই তরুণদের সামনে ইসলামের প্রকৃত আকিদা তুলে ধরার জন্য হেযবুত তওহীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে আন্দোলনের আদর্শ নিজেদের ক্যাম্পাসে প্রচারের কাজ করতে হবে। মাননীয় এমামকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তবেই বলা যায়, ছাত্রসমাজের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষী আমরা তৈরি করতে পারব।

ভ্রমণকাহিনী

চাষীরহাট গ্রামে একদিন

অচিকীর্ষু লৌকিক

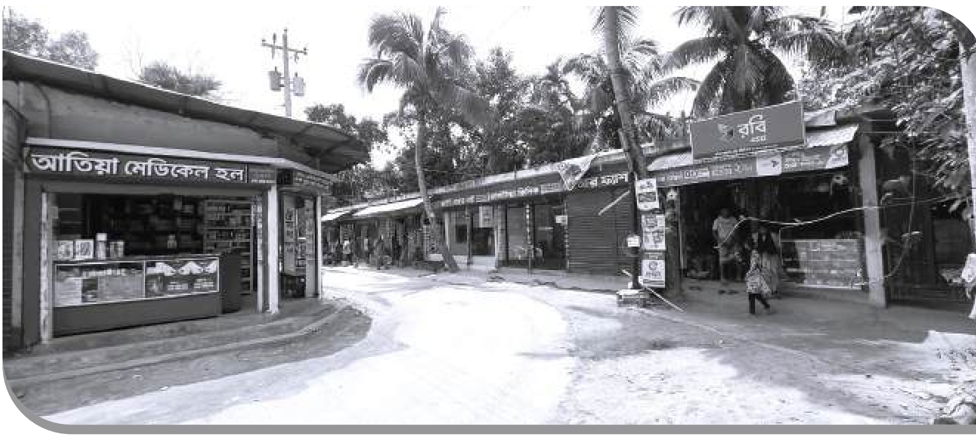

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী চৌরাস্তা থেকে লাকসামের দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ পেরুলে মেইন রোডের পাশে 'চাষীরহাট' নামে একটা বাজার আছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে বন্ধুদের সাথে গিয়েছিলাম। রাত আনুমানিক দশটা। আমরা ভালোমানের খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছি। একটা ভেজালমুক্ত খাবারের নির্ভরযোগ্য রেস্টুরেন্ট দরকার। বিশেষ করে যেখানে তাজা মিষ্টি পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে একজন চাষীরহাটের প্রস্তাব করলো। এর আগে নাম শুনলেও কখনও যাওয়া হয়নি। শীতকালে পিঠা উৎসবের জন্য পোরকরা গ্রামের এই বাজারটির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আয়তনের দিক থেকে তেমন বড়সড় কোনো বাজার না। হাতেগোনা কয়েকটি দোকানপাট। মোটামুটি সব ক্যাটাগরির সমন্বয় রয়েছে এখানে। তাজা মাংসের দোকান, রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকান, ফার্মেসি, মিল, তাঁতের কারখানা, চা দোকান, মুদি দোকান, কনফেশনারী ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাজারে। রেস্টুরেন্টে ঢোকার আগে আমরা ভ্যানগাড়ির চিতই পিঠার দোকানে দাঁড়ালাম। স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে গরম গরম চিতই পিঠা বিক্রি করছে। পাঁচ মিশালী ভর্তা দিয়ে কয়েকটা চিতই পিঠা খেয়ে নিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ মরিচের ভর্তা খায়না, সাথে সাথে মরিচের ভর্তা বদলে তার পছন্দসই ভর্তা দেয়া হলো। পানি চাইলে ভালোভাবে গ্লাস ধুয়ে বারবার আমাদের পানি দিয়ে যাচ্ছে মহিলাটি। আমাদের আচরণে তারা মোটেও ক্লান্ত নয়। বরং হাসিমুখে বারবার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে আর কী লাগবে। আমরা তাঁতের কারখানায় ঢুকে বিনা বাধায় ভিডিও করলাম। কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বাইরে বসে দুজন পত্রিকা পড়ছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম গুরুত্বপূর্ণ কী খবর আছে? হাসিমুখে পত্রিকা এগিয়ে দিলেন। অতি বিনয়ের সহিত আমাদের বসতে বললেন। আমি কয়েকদিন যাবত ডেন্টাল ক্লিনিক খুঁজছিলাম দাঁত ওয়াশ করানোর জন্য। আলসেমি আর সময়ের অভাবে যাওয়া হয়না। বাজারের মোড়ে একটা ডেন্টাল ক্লিনিকও পেয়ে গেলাম। ডাক্তার অনুপস্থিত থাকায় আমরা অপেক্ষা করছি। আমার এক বন্ধু বললো চল এই ফাঁকে বাজারের শেষ মাথায় শহিদী মসজিদ নামে একটা বড় মসজিদ আছে। দেখে আসি। মসজিদে ঢুকতেই সিকিউরিটি গার্ড আমাদের পরিচয় জানতে চাইলো। বললাম আপনাদের মসজিদ দেখতে এলাম। মসজিদ দেখতে অনুমতি লাগবে নাকি! গার্ড একজনকে ফোন করে আনলো। তার সহযোগিতায় আমরা মেহমানের মর্যাদায় মসজিদ পরিদর্শন করলাম। ভেতরে মানুষ নামাজ আদায় করছে। মসজিদের দরজা নেই। দরজা না থাকার কারণ মসজিদটি সবার জন্য উন্মুক্ত। দোতলায় নারীদের নামাজের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় তলায়ও নামাজ হয়। আবার বিবাহের জন্য একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মহা ধুমধামে বিবাহ করা জরুরী নয়। মাত্র একটি খেজুরের আপ্যায়নে এখানে অনেকগুলো বিবাহ হয়েছে। এতোবড় একটা

মসজিদের ইমাম বা খতিব নামাজ শেষে তরকারি বিক্রি করে সংসার চালান। ইমাম হিসেবে তাঁর মনে কোনো অহংকারবোধ নেই। মসজিদের পাশেই ব্যাচেলর কলোনি। পুকুর গাছপালা। অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। চাষীরহাট বাজারে একটা কাগজের টুকরা নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজার। গ্রামের হাটবাজারে সাধারণ ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। এই বাজারটি ব্যতিক্রম। বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ভাষা প্রায় একই রকম। কথার ধরণ, আচার ব্যবহার অত্যন্ত বিনয়ী। আমরা বাজারে ফিরেই ডাক্তারের দেখা পেয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক মেহনত করে দাঁত ওয়াশ করে দিলেন। একদম চকচকে ঝকঝকে হয়ে গেলো। আমি ভাবলাম চার পাঁচ হাজারের বিল আসবে। উনি এক হাজার টাকার একটা বিল করে দিলেন। আমাদের মধ্য হতে একজন বললো ডিস্কাউন্ট করেন। সাথে সাথে দুইশো টাকা কমিয়ে দিলেন। ডাক্তারের বয়সও খুব বেশি না। তরুণ বয়সী একটা ছেলে। আমি ডাক্তারের হাতে এক হাজার টাকার নোট দিয়ে বললাম, এটা রাখেন। আপনিতো মিয়া অনেক কম চার্জ করেছেন। ডাক্তার বললেন আমরা অতিরিক্ত চার্জ নেইনা। এটা আমাদের মাননীয় এমাম সাহেবের শিক্ষা।

রেস্টুরেন্টে বিল দেয়ার সময়ও অবাক হয়েছি। চারজন মিলে এতোকিছু খেলাম। বিল হয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো টাকা। ভদ্রতা, সততার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখলাম চাষীরহাটের মানুষের কাছে। আমার মনে হয় এই বাজারে কারো টাকা পয়সা হারায়ে গেলে, পরের দিন এসে ঠিকই তার টাকা সে ফেরত পাবে। কোনো চুরি নেই, মারামারি নেই, অভদ্র আচরণ নেই। নারীরা নিরাপদে কাপড়ের দোকান পরিচালনা করছে। কারো কুদৃষ্টি নেই। ধর্ষণ নেই। এখানকার পরিবেশ একজন অসভ্য ব্যক্তিকেও সভ্য হতে বাধ্য করবে। আমরা চলে আসার সময় একজন আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। অনেক দূর থেকে এসেছি জেনে আমাদের চা নাস্তা করালেন। লোকটার নাম মঈন উদ্দিন সম্ভবত। আমি তাঁর এই আচরণে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। মনের ভুলে তাঁর ফোন নাম্বারটি নেয়া হয়নি। সরকার পতনের পর দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কথা ভেবে এবারের পিঠা উৎসবটি করা হয়নি। ইচ্ছা আছে আগামী শীতে চাষীরহাট বাজারে যাবো। তাদের পিঠা উৎসবটি মিস করতে চাইনা...

[লেখক একজন প্রবাসী বাঙালি। লোকমুখে চাষীরহাটের কথা শুনে স্বচক্ষে দেখতে আসেন এবং নিজের অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ফেসবুকে শেয়ার করেন। লেখাটি তার ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া হয়েছে। - সম্পাদক]

হামলা/নির্যাতন

ঈদুল আযহার সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগে হামলা

- মানিকগঞ্জ:

গত ৬ জুন শুক্রবার (৬ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঈদের সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগ চলাকালে মানিকগঞ্জের সিংগাইড় উপজেলার গোলাইডাঙ্গা বাজারে হেযবুত তওহীদের চারজন সদস্যের ওপর হামলা করা হয়। জানা যায়, সকালে গোলাইডাঙ্গা বাজারে পত্রিকা বিক্রি করছিলেন হেযবুত তওহীদের মানিকগঞ্জ শাখার সদস্য আব্দুল মজিদ ও আওলাদ হোসেন। এসময় আব্দুল হাই নামের এক স্থানীয় ব্যক্তি তাদের বাধা দিলে কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টি তাৎক্ষণিক মানিকগঞ্জ জেলা আমির মহিদুর রহমানকে জানানো হলে তিনিও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরইমধ্যে আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে একদল লোক তাদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি মহিদুর রহমান। পরে তাকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর আহত বাকি তিনজন সদস্যকে স্থানীয় জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা করা হয়। হামলায় আহতরা হলেন- হেযবুত তওহীদের মানিকগঞ্জ জেলা সভাপতি মহিদুর রহমান, হেযবুত তওহীদের সিংগাইর উপজেলা সভাপতি মো. লালমিয়া এবং সদস্য আব্দুল মজিদ ও আওলাদ হোসেন। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলমান আছে।

- ভোলা:

গত ১০ জুন মঙ্গলবার ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকেরহাট বাজারের পাশে মঞ্জু টি-স্টলের সামনে পত্রিকা বালাগকালে হেযবুত তওহীদের সদস্যা তাহমিনা আক্তার রুমিকে মারধর, শ্লীলতাহানি করে একটি উগ্রবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। তারা তার হাত থেকে পত্রিকা কেড়ে নেয় এবং সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে ও হুমকি ধামকি দিতে থাকে। জানা যায়, হেযবুত তওহীদের ভোলা শাখার সদস্যা তাহমিনা আক্তার রুমি, রুমা আক্তার ও ইরিনা আক্তার ইভা ব্যাংকেরহাট বাজারে সর্বাত্মক পত্রিকা বিক্রি করতে গেলে অভিযুক্ত

উগ্রবাদী নাজিম ও তার ১০-১২ জন সহযোগী তাদের পথরোধ করে। তারা পত্রিকাটিকে একটি 'জঙ্গী সংগঠনের পত্রিকা' বলে প্রচার করে এবং বিক্রি করতে নিষেধ করে। মোজাহেদা তাহমিনা আক্তার তাদের কথার প্রতিবাদ করলে সেখানে তর্কাতর্কি শুরু হয়। এক পর্যায়ে নাজিম তার হাত থেকে ৫০-৬০টি পত্রিকা কেড়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পত্রিকা পোড়ানোর কারণ জানতে চাইলে অভিযুক্তরা তাকে কিল-ঘুষি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে এবং তার পরনের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলে শ্লীলতাহানি করে। তাকে বাঁচাতে অপর দুই মোজাহেদা রুমা ও ইভা এগিয়ে এলে তাদেরও মারধর করা হয়। এসময় মোবাইল ফোনে ঘটনার ভিডিও ধারণ করার চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এসময় তাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে মোবাইল ফোনগুলো ফিরিয়ে দেয়। "অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় হুমকি দিয়ে বলে যায়- "ভবিষ্যতে এই পত্রিকা বিক্রি করতে দেখলে তোদের লাশ গুম করে ফেলব।"

এই ঘটনায় মোজাহেদা তাহমিনা আক্তার রুমি (৩৮) বাদী হয়ে নাজিম (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে প্রধান অভিযুক্ত করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে ভোলা সদর মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এতে ১২ জুন নাজিম ভয় পেয়ে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্ততায় তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন এবং লিখিত মুচলেকা দেন। পাশাপাশি নগদ ৫ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেও ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় সে। এভাবেই হেযবুত তওহীদের সদস্যাদের উপর চড়াও হওয়ার জন্য তাকে অপমানিত ও ক্ষমা চেয়ে মুচলেকা দিতে বাধ্য করেন আল্লাহ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বেলুমিয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপ পরিদর্শক সাইদুর রহমান, ভোলা জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি আতাউর রহমান, ভেদুড়িয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামির সভাপতি মোহাম্মদ হাসনাইন, বাংলাদেশ সাংবাদিক সংস্থা ভোলা জেলার সভাপতি শহীদ তালুকদার, সহ-সভাপতি আবুল বাশার কামরুল প্রমুখ।

- কুমিল্লা:

গত ১০ জুন মঙ্গলবার কুমিল্লার নাঙ্গলকোট বাজারের সোনালী ব্যাংকের সামনে সর্বাত্মক পত্রিকা নিয়ে বালাগ করতে গেলে হামলা শিকার হন হেযবুত তওহীদের সদস্যা রেহানা রহমান ও কাজী মেহেদী। জানা যায়, ঘটনার দিন সকাল পৌনে এগারোটার দিকে নাঙ্গলকোট বাজারে পত্রিকা বিক্রি করছিলেন তারা। এসময় এক মুদি দোকানদার পত্রিকা কেনার জন্য তাদের ডাকলে তারা সেখানে যান। তখন অভিযুক্ত মাওলানা নেছার উদ্দিন ওই দোকানদারকে বলেন, "এই পত্রিকা খ্রিস্টানদের, এটি কিনলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।" দোকানদার এই কথায় কান না দিয়ে পত্রিকাটি ক্রয় করলে মাওলানা নেছার ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। তারা এ আচরণের প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত মাওলানা মোজাহেদা রেহানা রহমানের গায়ে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। এসময় মোজাহেদ কাজী মেহেদী তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে মাওলানা নেছার ও তার সঙ্গে থাকা ৩-৪ জন সহযোগী তাকেও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে। তাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। যাওয়ার আগে তারা ওই এলাকায় পত্রিকা বিক্রি করলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ ঘটনায় পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যথাযথ আইনানুগ কার্যক্রম চলমান আছে।

জয়েনিং প্রোগ্রামে বাধা

রোজিনা আক্তার: আমি ময়মনসিংহ বিভাগীয় নারী সম্পাদিকা। আমার শাখা জামালপুর এবং আমির আনোয়ার হোসেন। গত ৭ মে আমাদের ঐক্যবদ্ধ এক ভাই তাদের গ্রামের বাড়িতে একটি জয়েনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি আমাদের কথা বলার জন্য যেতে বলেন। আমরা তিনজন বোন, আমি, ফরিদা পারভীন এবং শারমিন খানম আমিরের সঙ্গে কথা বলে সেই প্রোগ্রামে অংশ নিতে যাই। বাড়ির ভেতরে ঢোকার পথে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হলে তিনি হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে তাকে জানায়। আর যোগদান অনুষ্ঠানে তার চাচিকে নিয়ে আসতে বলে। তার এই ভাইটি ছিল মোল্লা টাইপের। তাই তার সঙ্গে কথা বলার সময়ই তার আচরণ ও কথাবার্তায় আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা যে ঘরে বসে কথা বলছিলাম সেখানে সরাসরি এক মোল্লা এসে বলে "এখানে হেযবুত তওহীদের কোনো প্রোগ্রাম করা যাবে না।" তার কথা শুনে আমাদের ভাইটি প্রতিবাদ শুরু করে। তিনি বলেন, "এটা আমার পৈতৃক ভিটা, এখানে আমার অধিকার আছে কথা বলার। আপনি নিষেধ করার কে?"

তখন মোল্লা বলেন, “হেযবুত তওহীদ হচ্ছে বাতিল ফেরকা। এই বাতিল ফেরকার কোনো অনুষ্ঠান এখানে করা যাবে না।”

কথাটি শুনে আমি তাকে বলি যে, আমরা কী বলি তা না শুনে আপনি আমাদের বাধা দিতে পারেন না। তাছাড়া এখানে আরও অনেক লোকজন আছে, তারা আমাদের কথাগুলো শুনুক। শোনার পর যদি আপত্তিকর মনে হয়। আমাদের বলবেন আমরা আর আসব না। ইসলামের কথা বলার অধিকার সবার আছে। তাছাড়া এই বাড়িটা যার তার আয়োজন করা প্রোগ্রামেই আমরা কথা বলছি। কাজেই আপনি এখানে এসে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করবেন না। আমাদের এসব কথা শুনে সে বলে, 'আমি এই মহল্লার ইমাম'। তখন আমরা তাকে বলি যে, আপনি ইমাম হোন আর যাই হোন না কেন হেযবুত তওহীদ বাতিল ফেরকা সেটা প্রমাণ করেন আগে। এসব কথার কোন যথাযথ উত্তর সে দিতে পারছিল না। ফলে কোন উত্তর না দিয়ে সে সেখানে থেকে সরে যায়। মোল্লা যেতে না যেতেই সেখানে আরেকজন ধর্মান্ধ মহিলা এসে এবার আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। সে আমাদের বলে, “এখানে আপনারা আর কোনো কথা বলবেন না, আপনারা চলে যান।” তখন আমাদের ভাইটি এক পর্যায়ে রাগ করে বলেন, “আপা, চলেন, আমরা আর এখানে থাকব না। অন্য কোথাও বসব।”

ঘর থেকে বের হতেই আমরা দেখি আরও তিনজন মোল্লাকে নিয়ে এসেছে আগের মোল্লাটি। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছে। আমি তাদের কথাবার্তা ভিডিও করার চেষ্টা করলে তারা বুঝে ফেলে এবং তারাও ভিডিও করা শুরু করে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আমি তাদের ভিডিও করতে নিষেধ করি। তারা ভিডিও বন্ধ করে দেয়। আমাদের একজন ভাই তখন তাদের হাতে হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দেয় এবং বলে যে এত কথা না বলে এই হ্যান্ডবিলটা পড়ুন, এতে কী লেখা আছে সেটা জানুন। তারপর তারা হ্যান্ডবিলটা হাতে নেয়। মোল্লাদের হ্যান্ডবিল নেওয়া দেখে পাশে থাকা মহিলারাও একটি করে হ্যান্ডবিল নেয়। পরবর্তীতে যখন তারা আবারও উপস্থিত মহিলাদেরকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে তখন আমরা আরেকটু কঠিনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলি। সকলের সামনে তাদের স্বার্থ হাসিলের বিষয়টি তুলে ধরি। এরকম তর্ক-বিতর্ক দেখে সেখানে অনেক লোক (বিশেষত নারীরা) জড়ো হয়ে যায়। আমরা কৌশলে পাশে দাঁড়িয়ে থেকেই আমাদের মূল মেসেজ, নারীদের অবস্থান, রসুলের যুগে নারীদের ইতিহাস ইত্যাদি আমাদের আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরি। সবকিছু শুনে সেখানে উপস্থিত অনেক মহিলা আমাদেরকে তাদের বাড়িতে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং আমাদের কথায় কোনো ভুল নেই বলেও মন্তব্য করেন। ঘটনাস্থল থেকেই আমরা আমিরকে বিষয়টি জানাই। আমির বলেন, 'যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে বসে কথা বলতে পারেন।' এরপর আমরা আবার বক্তব্য দেওয়া শুরু করি। কিন্তু আগের সেই মহিলাটি আবার এসে বাধা দেন। আমরা তার বাধা উপেক্ষা করেই সকলের সামনে আরও কিছুক্ষণ কথা বলি। এদিকে মোল্লারাও একজন-দুইজন করে করে আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। যদিও সামনে আসেনি। এই সময়ের মধ্যেই আমরা উপস্থিত মহিলাদের কাছে আমাদের আন্দোলনের মূল বক্তব্য পৌঁছে দিই। তাদের মধ্যে অনেকে আমাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছে। ঐ ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করে তবেই আমরা বাড়িতে ফিরে আসি। তবে আল্লাহর দয়ায় সেই দিন তেমন বড় কোন বাধার ঘটনা ঘটেনি।

সাম্প্রতিক

এক যুগের হয়রানির অবসান

মিথ্যা মামলা থেকে ৫ সদস্যের অব্যাহতি

একযুগ আগের পুরোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা অভিযোগে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে গাইবান্ধায় হেযবুত তওহীদের ৫ সদস্যকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছেন আদালত। রবিবার (২৬ জানুয়ারি ২০২৫) গাইবান্ধা জুডিশিয়াল প্রথম আদালত পৃথক দুই মামলার রায়ে তাদের খালাস প্রদান করেন। এ সময় অব্যাহতি পাওয়া সদস্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। খালাসপ্রাপ্ত হেযবুত তওহীদের সদস্যরা হলেন- মো. আরজু আহম্মেদ (৩৫), মো. ইমরান আলী (৩৪), মেহেরজান নেছা (৪০), শামীমা আক্তার (৩০) এবং আল্পনা আক্তার (৩০)। মামলার রায় ঘোষণার পর তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন হেযবুত তওহীদের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। অবসান ঘটে একযুগের হয়রানির।

জানা যায়, ২০১২ সালে গাইবান্ধা শহরে হেযবুত তওহীদের প্রকাশনা ও আদর্শিক বক্তব্য সম্বলিত

হ্যান্ডবিল প্রচার করছিলেন মো. ইমরান আলী ও আরজু আহম্মেদ। স্থানীয় একটি মহল তাদের কাজে বাধা প্রদান করে এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে পুলিশে অভিযোগ করে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় এবং ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখায়। পরবর্তীতে গাইবান্ধা থানার এসআই ফিরোজ হোসেন বাদী হয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে মামলা করেন। অপর মামলাটি ঘটে ২০১৩ সালে। যখন শামীমা আক্তার, মেহেরজান নেছা ও আল্পনা আক্তার গাইবান্ধা বাসস্টান্ডে একই লিফলেট বিতরণ করার সময় স্থানীয় কিছু উগ্রবাদী লোক প্রথমে বাধার সৃষ্টি করে এবং পরে ভুল তথ্য দিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় গাইবান্ধা থানার তৎকালীন এসআই শাহাদত হোসেন বাদী হয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আরেকটি মামলা করেন। প্রথম মামলায় অভিযুক্তদের ছয় মাস ও দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্তদেরকে আড়াই মাস কারাবন্দি রাখা হয়। পরে জামিনে মুক্তি পান তারা। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে চলা মামলা, আদালতে হাজিরা এবং সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে রবিবার আদালত তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে জানিয়ে উভয় মামলার আসামীদেরকে খালাস দেন।

বেকসুর খালাস পেলেন ঢাকার দুই সদস্য

দীর্ঘ এক যুগের হয়রানির পর অবশেষে মিথ্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন হেযবুত তওহীদের দুই সদস্য মো. ইজাননবী ও এমরান হোসেন। ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তাদের বেকসুর খালাস ঘোষণা করে রায় প্রদান করে জেলা জজ আদালত। ২০১২ সালের জুলাই মাসে হেযবুত তওহীদের দুই সদস্য মো. ইজাননবী ও এমরান হোসেন রাজধানীর গুলিস্তান সংলগ্ন হকার্স মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে হেযবুত তওহীদের আদর্শ সম্বলিত "আল্লাহর মোজেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা" এবং দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয়, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি বর্ণনা করে দাজ্জাল ধ্বংসের বার্তা প্রচার করছিলেন এবং হেযবুত তওহীদ প্রকাশিত কিছু বই বিক্রয় ও প্রচারপত্র বিলি করছিলেন। এ সময় এলাকার কিছু লেবাসধারী উগ্রবাদী ব্যক্তি তাদের নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য বলে মিথ্যা তথ্য পুলিশকে দেয়। পুলিশের টহল দল সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাদের নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য সন্দেহে আটক করে।

এসময় মোঃ ইজাননবী ও এমরান হোসেন হেযবুত তওহীদের বৈধতার স্বপক্ষে সকল কাগজপত্র প্রদর্শন করলেও প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে পল্টন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং-১৭০৩/২০১২) করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ওই বছরের ২৫ নভেম্বর পল্টন থানায় প্রথমে ৫৪ ধারায় এবং পরে ১৫৩/১৫৩(ক)/৫০৫/৫০৫(ক) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। পরে মো. ইজাননবী ও এমরান হোসেন উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন করেন। দীর্ঘ তদন্ত ও অনুসন্ধানেও কোনো অপরাধের প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও মামলা চালু রাখা হয়। পরে মামলার আসামিরা উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে বিজ্ঞ আদালত তাদের নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

দীর্ঘ নয় বছরের হয়রানির অবসান

মানিকগঞ্জে দীর্ঘ নয় বছর আগে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন হেযবুত তওহীদের ৬ সদস্য। মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) মানিকগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলার সকল আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করেন। এ সময় তারা সকলে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অব্যাহতিপ্রাপ্তরা হলেন, হেযবুত তওহীদ মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি মহিদুর রহমান, সদস্য নিয়ামত আলী, মোতালেব হোসেন, কামরুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম ও জুয়েল আহমেদ। মামলার রায় ঘোষণার পর তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন হেযবুত তওহীদের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। অবসান ঘটে একযুগের হয়রানির। জানা যায়, ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া এলাকায় হেযবুত তওহীদের সাংগঠনিক প্রচারকাজে অংশ নেয়ার সময় কয়েকজন গ্রাম পুলিশের সদস্য তাদেরকে বাধা প্রদান করে থানায় খবর দেয়। পরে সাটুরিয়া থানা পুলিশ তাদের আটক করে প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬/৩, ১৫/২/২৫ ধারায় সন্ত্রাসমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের একটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় তিন মাস কারাগারে থাকার পর জামিনে মুক্ত হন তারা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চলা মামলা, আদালতে হাজিরা এবং সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে গতকাল মঙ্গলবার আদালত তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় হেযবুত তওহীদ সদস্যদেরকে বেকসুর খালাস দেন বিজ্ঞ আদালত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাননীয় এমাম সম্পর্কে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মন্তব্য

- আপনার মতো ইমাম পুরো দুনিয়ায় দরকার। আপনাকে আমার কোটি কোটি স্যালুট।

প্রিন্স বিশ্বাস

- Very intelligent man. We need more people like you in Bangladesh who can take our country to the right direction.

Maximum Homebiz

- প্রথম প্রথম যখন আপনার ভিডিও দেখতাম সত্যি বলতে আপনাকে খুব একটা ভালো লাগতো না তবে এখন নিয়মিত আপনার ভিডিও দেখি আপনার যুক্তি এবং বক্তব্য অনেক স্পষ্ট। আপনার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে কাউকে খুশি করার মত কোন কথা বলেন না যেটা সত্য সরাসরি সেটাই বলেন। আপনার এই স্পষ্টবাদী বক্তব্য অনেক ভালো লাগে। এক কথায় আপনার বক্তব্যের উপর ভরসা রাখা যায়। ধন্যবাদ।

আরাফাত হোসেন

- উনার ভিডিও গুলো আমি নিয়মিত দেখি এবং উপভোগ করি। উনার বক্তব্য খুব স্পষ্ট, উনার যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। বাপ দাদার ধারাবাহিকতায় অন্ধের মতো যে ধর্মকর্ম এতদিন পালন করে এসেছি, আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার সবই ভুল প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের তথাকথিত ধর্ম গুরুরা ধর্মের যথাযথ মর্ম বুঝে হোক অথবা না বুঝে হোক মানুষকে প্রকৃত ধর্মচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। মানুষ গুনে গুনে পাঁচ বেলা নামাজ পড়াকেই এখন মূল

ধর্মচর্চা বলে মনে করছে। ফলে আজ আপনারা যে কথা গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছেন তা গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। পারতপক্ষে আপনারা যুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন, আপনাদের সাহসিকতার প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা রইলো। এই যে গুনে গুনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ কখন কিভাবে ধর্মের মূল চর্চা হয়ে গেলো নিজেই ভেবে পাই না। আপনার ইমাম এবং আপনার উপস্থাপনা আমার অন্তর ছুঁয়ে যায়। আপনাদের লক্ষ্যের সফলতা কামনা করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

▪ আপনার ভিডিও ইন্ডিয়া কোলকাতা থেকে দেখি। আপনি পুরো বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। আমাদের এই মূর্খ জাতিটা আপনাকে গালাগালি করবে। আপনি তাতে ভিডিও করা ছাড়বেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

▪ Respected, Imam Shaheb. I am Bengali Hindu from Kolkata. I like and love your valuable, informative, real truth base analysis in all subject, whenever I look your videos, even I couldn't skip it. With love and respect, Somnath.

Somnath Chakraborty

▪ আমি একজন হিন্দু হয়েও আপনার এপিসোডগুলো দেখি। আপনার প্রতিটি কথা যুক্তিপূর্ণ। ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ভালো থাকবেন।

বিকাশ সরকার

▪ আমি একজন সনাতনী, আপনার আলোচনা যুক্তিসম্মত, বাস্তবসম্মত। আপনার আলোচনা শুনি। আজকের দুনিয়ায় আপনার মতো মুসলিম খুবই প্রয়োজন। আপনার কথাগুলো শুনলে মনে হয় সনাতনী আর ইসলামের মূল বক্তব্য এক।

স্বপন সরকার

▪ আমি একজন ভারতীয়। আমি কট্টর মুসলিম বিরোধী হিন্দু। তবুও ওই মৌলবীর কথা আমার অন্তরে খুব ভালো লাগতেছে। কিনার মতন আমাদের ভারতবর্ষে যদি ৫ জন লোক থাকতো তাহলে হিন্দু-মুসলমান আর কোন ঝগড়াঝাঁটি বিবাদ থাকতো না। ধন্যবাদ ইমাম সাহেব আপনাকে।

শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল

▪ আমি বাংলায় এম.এ এবং হাফেজ। আমি পশ্চিমবঙ্গের একজন মঞ্চ শিল্পী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করি। এই কথাগুলো আমি বলছি বহুদিন আগে থেকেই আপনার সাথে প্রত্যেকটি কথার লাইন টু লাইন আমার মিল। ইসলামিক দেশে ইসলামিক আইন থাকবে না কেন আল্লাহর আইন থাকবে না কেন। আল্লাহ যদি কোনদিন সুযোগ দেয় বাংলাদেশে আসি ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে মোলাকাত হবে।

এঙ্কর নাসির আনসারি

▪ আমি হিন্দু হয়েও বলছি ভগবান/আল্লাহ আপনাকে নিশ্চয় পাঠিয়েছে, ইসলাম ধর্মের কট্টরতা থেকে দূরে সরে মানবতা ও দয়ার দিয়ে ইসলামকে প্রসার করছেন। ধন্যবাদ আপনাকে যাহাতে কট্টর ইসলামকে মানবতার ইসলামে পরিবর্তন করছেন। ধন্যবাদ সেলিম ভাই।

মনি ঘোসিংহ

▪ এতো দিনের ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে এলাম আপনার বক্তব্য শুনে। এতো সুন্দর বিস্তারিত আলোচনা আগে কোথাও পাইনি দিন দিন আপনার প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে পড়ছি আপনার বক্তব্য গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় ভিতর থেকে শ্রদ্ধা চলে আসলো গাজওয়াতুল হিন্দ যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় এইটুক নিশ্চিত আমি।

মরিয়ম জেরিন

▪ আমি দীর্ঘদিন যাবত সাদপন্থী তাবলীগের মেহনতের সাথে জড়িত আছি তখন আমি জানতাম না যে এখানে এত গ্রুপিং হচ্ছে, হঠাৎ একদিন এক আলেম ভাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কথার দ্বারা আক্রমণ করে, তারপর থেকে আমার ঈমানী হালদ খুবই খারাপ যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ আপনার ভিডিও আমার সামনে আসে তারপর থেকে আমি ইসলামকে নতুনভাবে চিন্তে শুরু করি, এখন আমি আল্লাহর রহমতে কোনোটি ধর্ম আর কোনোটি ধর্মব্যবসা আমার সামনে সবই খোলাসা, তখন থেকে আমি হিযবুত তাওহীদকে সমর্থন করি। আফসোস আমি এখনও কাউকে বলতে পারিনি। না জানে এ কথা বললে আমার বাড়িতে উগ্রবাদীরা হামলা করে, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থানায় যদি আপনাদের কোন প্রতিনিধি থাকে অথবা সমর্থক থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন, হিযবুত তাওহীদের জয় হবেই ইনশাআল্লাহ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

তীব্র তাপদাহে কীভাবে সতর্ক থাকবেন?

আফসানা মিম

চলমান হিট ওয়েভে জনজীবন বিপর্যস্ত। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোরসহ দেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৪০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি এই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই তাপমাত্রা মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে পারে এবং দীর্ঘসময় গরমে থাকলে হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এই তীব্র তাপদাহের মধ্যেও যেহেতু হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যাদের প্রতিনিয়ত মাঠে সরব থাকতে হচ্ছে তাই গরমে সুস্থ থাকতে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মানা জরুরী। পানিশূন্যতা, হিটস্ট্রোক, ডায়রিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের ঝুঁকি এড়াতে প্রয়োজন সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সচেতনতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (WHO) এ সময় পর্যাপ্ত পানি পান ও হালকা খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। তাই গরমে সুস্থ থাকতে প্রয়োজনীয় কিছু স্বাস্থ্যবিধি নিচে তুলে ধরা হলো।

গরমে খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত?

- কম মশলাযুক্ত হালকা খাবার:

গ্রীষ্মে দেহের বিপাক ক্রিয়া (metabolism) ধীর হয়ে যায়। ভারী ও মশলাযুক্ত খাবার হজমে বেশি সময় নেয়, ফলে শরীরের তাপমাত্রা আরও বাড়ে। তাই তরকারি কিছুটা পাতলা ঝোল করে রান্না করা ভালো। লাউ, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা ইত্যাদি সবজি খাবারের তালিকায় রাখা উচিত।

অতিরিক্ত তেল-চর্বি জাতীয় খাবার, রেড মিট সহ বাইরের ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

- শরীরকে হাইড্রেট রাখা:

শরীর থেকে ঘাম ও প্রস্রাবের মাধ্যমে প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ লিটার পানি বেরিয়ে যায়। গরমে তা আরও বেশি হয়। তাই দিনে অন্তত ১২-১৩ গ্লাস নিরাপদ পানি পান করা উচিত (WHO, ২০১৫)। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস কুসুম গরম পানি লেবু ও মধু মিশিয়ে খেলে হজমে সহায়ক হয়। পাশাপাশি লেবুর শরবত, ডাবের পানি বা টক দইয়ের সাথে শসা বা জিরার শরবত খাওয়া যেতে পারে। এগুলো শরীরের ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখে। শসা ও তরমুজের মতো জলীয় উপাদান বেশি এমন ফল ও সবজি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং হাইড্রেশন বজায় রাখতে সাহায্য করে। অনেকে আইসক্রিম বা কোমল পানীয় পান করেন, কিন্তু এগুলো সাময়িক স্বস্তি দিলেও শরীরে পানিশূন্যতা (dehydration) বাড়িয়ে দিতে পারে।

- পুষ্টিকর ফলমূল:

তরমুজ, বাঙ্গি, কমলা, পাকা পেঁপে জাতীয় ফল খেতে পারলে ভালো। এগুলো প্রচুর জলীয় উপাদানসমৃদ্ধ। এছাড়া এখন কাঁচা ও পাকা আম পাওয়া যাচ্ছে যা শরবত করে খাওয়া যায়। এসব ফল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন-সি ও মিনারেলে ভরপুর, যা তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

গরমে খাদ্য সংরক্ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ তাপমাত্রায় খাবারে ব্যাকটেরিয়া যেমন Salmonella, E. coli, Shigella দ্রুত জন্মায়। গবেষণা অনুযায়ী, ৫°C এর নিচে এবং ৬০°C এর উপরে তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। ৫-৬০°C এর মাঝে খাবার বেশিক্ষণ থাকলে তা “ডেঞ্জার জোন” এ পড়ে যায় (WHO, ২০২২)। প্রতিদিনের রান্না করা খাবার যেন ২ ঘণ্টার বেশি বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে গরম ভাত, মাছ ও দুধজাতীয় খাবার দ্রুত নষ্ট হয়।

- সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি:

রান্না করা খাবার ২ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিজে রাখতে হবে। ফ্রিজের তাপমাত্রা ৪°C এর নিচে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় (USDA, ২০২০)। বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্রিজ খুলে না রাখা ও খাবার দ্রুত চিহ্নিত করে খেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়। বরফ বা আইসপ্যাক ব্যবহার করে সাময়িকভাবে খাবার ঠান্ডা রাখা যেতে পারে, বিশেষ করে যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত। বাসী খাবার, দুধ, ভাত বা দই ইত্যাদি ফ্রিজে রাখার পর তা হালকা গরম করে খাওয়া উচিত। না হলে ব্যাকটেরিয়াজনিত ডায়রিয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

ডায়রিয়াসহ গরমকালীন রোগ থেকে বাঁচতে করণীয়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পানিবাহিত জীবাণু বা দূষিত খাবার গ্রহণ ডায়রিয়ার মূল কারণ। গ্রীষ্মকালে এসব রোগজীবাণুর বংশবিস্তার দ্রুত হয়। বাংলাদেশে গরমে শিশু ও বৃদ্ধদের ডায়রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় (আইসিডিডিআর, বি রিপোর্ট, ২০২১)। তাই এসব বয়সীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। সব সময় বিশুদ্ধ পানি পান করুন (ফিল্টার, ফুটানো, বোতলজাত)। খাওয়ার আগে, টয়লেটের পর ও বাইরে থেকে ফিরে সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধুয়ে নিন। স্ট্রিট ফুড যেমন ফুচকা, চটপটি, লেবুর শরবত, আখের সরবত এগুলো এড়িয়ে চলুন। খাবার ঢেকে রাখুন ও রান্নার জায়গা পরিষ্কার রাখুন। প্রতিদিন ৫-৬ বেলা অল্প অল্প করে খাওয়ার চেষ্টা করুন।

হিটস্ট্রোক ও অতিরিক্ত গরমে করণীয়

রোদে ছাতা বা ক্যাপ ব্যবহার করুন। হালকা রঙের সুতির কাপড় পরুন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দুপুরের তীব্র রোদে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত বাইরে বের না হওয়াই ভালো। সরাসরি সূর্যালোকে বেশি সময় থাকবেন না। বয়স্ক, শিশু ও গর্ভবতী নারীদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

হিটস্ট্রোকের লক্ষণ: মাথা ঘোরা, বমি, অতিরিক্ত ক্লান্তি, ঘামহীন শরীর ইত্যাদি। এসব হলে ছায়ায় নিয়ে ঠান্ডা পানিতে ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছিয়ে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে।

ডিটক্স ওয়াটার

লিভার, কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ আমাদের শরীরের টক্সিন বের করে দেয়। তবে এই গরমে অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হজমপ্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। এ সময় ডিটক্স ওয়াটার শরীরকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

- শসা, লেবু ও পুদিনার ডিটক্স ওয়াটার:

১ লিটার পানিতে কয়েক টুকরো শসা, পাতলা লেবুর টুকরো, ৭-৮ টি পুদিনা পাতা মিশিয়ে কাচের জারে রাখুন। ব্যাস হয়ে গেল!

- তরমুজের ডিটক্স ওয়াটার:

কাচের জারের মধ্যে এক লিটার পানি নিন। তার মধ্যে কয়েক টুকরো তরমুজ ও এক মুঠো পুদিনা পাতা মিশিয়ে দিন। আধ ঘণ্টা পর থেকে এই পানি খেতে পারেন।

তরমুজের বদলে আপেল, কমলা, আনারসও ব্যবহার করতে পারবেন। পছন্দনীয় ফলগুলো একইভাবে ছোট স্লাইস করে পানিতে ভিজিয়ে নিবেন।

- আপেলের ডিটক্স ওয়াটার: ২-৩ টুকরো আপেল, দারুচিনির অল্প পরিমাণে (একটি ভাঙা টুকরো) ও ১/২ চামচ মৌরি পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এই পানীয় খেতে পারেন। মৌরিতে আছে প্রচুর পরিমানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, এটি হজম প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়, গ্যাসের সমস্যা কমায়।

পুষ্টিবিদ, বি.এসসি. ইন ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

অকালে ঝরে যাওয়া প্রাণ

মহিতাপ বিন আকরাম

পিতা : মো. আকরাম হোসেন ফকির
মাতা: বেলি আক্তার
জন্ম: ২২ নভেম্বর ২০২৩
মৃত্যু: ২৪ মে ২০২৫

গত ২৪ মে আনুমানিক দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় নোয়াখালী সেনবাগ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় ট্রাকের চাপায় রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় মহিতাপ বিন আকরাম। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল দেড় বছর।

রাফা বিনতে নূর

পিতা: নূর ইসলাম
মাতা: রিনা পারভীন
জন্ম: ২৮ এপ্রিল ২০২৩
মৃত্যু: ২১ মে ২০২৫

গত ২১ মে রাত সাড়ে দশটায় ড্রেসিং টেবিল থেকে পড়ে মাথার গুরুতর আঘাত পেয়ে ইন্তেকাল করে রাফা বিনতে নূর। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল দুই বছর তিন মাস।

জাহানারা আক্তার

জন্ম: ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
মৃত্যু: ২২ মে ২০২৫
আন্দোলনে যোগদান: ২২ জুলাই ২০১১

গত ২২ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় মিরপুর শাখার প্রবীণ মোজাহেদা জাহানারা আক্তার ব্রেইন স্ট্রোক করে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পর্দা করার পূর্বে তিনি ওসিয়ত করেন যে, চিকিৎসার জন্য যদি তার চোখে অপারেশন করতে না হয় তাহলে সমিতিতে জমানো তার টাকা যেন ফান্ডে দিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দিক আমিন।

সাইফুল ইসলাম

ডাকনাম: সাইফুল মিলিটারি
জন্ম: ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮১
মৃত্যু: ০৩ জুন ২০২৫
আন্দোলনে যোগদান: সেপ্টেম্বর ২০১৫

দীর্ঘদিন লিভারজনিত সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর গত ০৩ জুন ঢাকার উত্তরায় এন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর পূর্বে মাননীয় এমামের সাথে তাঁর অন্তিম কথোপকথন হয়। তার সেই শেষ কথোপকথনের স্মৃতিচারণ করে তাকে নিয়ে বলা মাননীয় এমামের করা অভিব্যক্তিটি নিচে তুলে ধরা হলো-

একজন আনুগত্যশীল মোজাহেদের সাথে মাননীয় এমামের অন্তিম কথোপকথন

মাননীয় এমামের ভাষ্যমতে–

আমি তিনদিন আগেই মাত্র নোয়াখালী গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ঈদের কার্যক্রম শেষ করে একবারে ঢাকা ফিরব। কিন্তু হঠাৎ গতকালকে ঢাকায় আসার জন্য কেন জানি অস্থির হয়ে উঠলাম। আসলে একজন মোখলেস মুজাহিদের অন্তিম সাক্ষাতের আকুতি আমাকে ভিতর থেকে তার কাছে টানছিল, যা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। আব্বা বললেন, কি ব্যাপার, হঠাৎ আবার ঢাকা যাওয়ার দরকার কী? আমি বললাম একটা কাজ আছে। ঈদের পত্রিকার কাজও আছে। আগেরদিন দুপুর বেলা আমি যখন খামারবাড়িতে অবস্থান করছিলাম, হাসপাতাল থেকে মেহেরপুরের মুজাহিদ সাইফুল মিলিটারীর স্ত্রী চম্পা ফোন দিলেন। বললেন, মাননীয় এমাম, আপনার সাথে সাইফুল ভাই কথা বলবেন।

-আমি হ্যালো বললাম।

-শুনলাম ওই প্রান্ত থেকে সাইফুল মিলিটারির দৃঢ় কণ্ঠ। আমাকে তিনি বলছেন, এমাম আমি হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাব। কিন্তু আপনার সাথে সাক্ষাৎ না করে যাব না। আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। সাক্ষাৎ করা দরকার।

-তখন আমি বললাম, 'আমি তো বাড়িতে চলে এসেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। যদি আমি ঢাকায় আসি তাহলে আপনার সাথে দেখা হতে পারে। আপনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে উত্তরায় থাকেন। আমি আসলে দেখা হবে।'

কিন্তু গতকাল দুপুরে তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে আর দেরি করলাম না। সাড়ে তিনটার দিকে রওনা দিলাম কিন্তু সাড়ে সাত ঘণ্টা লাগলো ঢাকায় পৌঁছাতে। অবশেষে রাত বারোটার পরে সাইফুলের সাথে দেখা হল। তিনি তখন জালাল ভাইয়ের বাসায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি উনাকে দেখতে গেলাম। সেখানে তার সঙ্গে আমার শেষ কী কথা হল তা তুলে ধরছি।

-আমি: সালামু আলাইকুম সাইফুল্লাহ ভাই।

-সাইফুল: ওয়ালাইকুম সালাম মাননীয় এমাম আসছেন? এমাম আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার কিছু কথা ছিল।

-আমি: আপনার শরীরের এখন অবস্থা কি? কেমন লাগছে?

-সাইফুল: ডাক্তার বলেছেন আরেকটা টেস্ট করতে হবে। ক্যান্সার আছে কিনা কনফার্ম করার জন্য। থাকলেও কী পরিস্থিতি। হার্ট একদম ঠিক, কিডনিরও কোনো সমস্যা নেই। তিনদিন ধরে কিছু খেতে পারছি না।

-আমি: আপনার তো হার্টবিট ঠিক আছে। শরীর একটু ঠাণ্ডা। যা-ই হোক, বলেন কী কথা আমার সাথে।

-সাইফুল: মাননীয় এমাম, আমি তো এভাবে যেতে চাইনি। আমার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আমি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করব, জেহাদের ময়দানে থাকব।

-আমি: আপনি তো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছেনই। এখন আপনার যে পরিস্থিতি আমি দেখতে পাচ্ছি, কয়েকদিন থেকে খাবার বন্ধ। এতে আমার মনে হচ্ছে আপনার জার্নি শেষ। এ পর্যন্তই। তো আপনি নিরাশ হবেন কেন? মনঃক্ষুন্ন হবেন না। মো'মেনদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা, তিনি আপনার জন্য স্পেশাল জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। আন্দোলনের সকল কাজে আপনি দৃঢ়তার সাথে অংশ নিয়েছেন। আমার উপরে আপনার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আমি পেয়েছি।

-সাইফুল: মাননীয় এমাম, আপনি কি আমার উপর খুশি? আমার স্ত্রী পুত্র সহায় সম্বল যা কিছু আছে আমি সব আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিলাম। নোয়াখালীতে যে জমিটা নিয়েছি, সেখানে ঘর করার ইচ্ছা ছিল। আমার সন্তানরা চাষীরহাট স্কুলে পড়ে। ওদেরকে আমি বলেছি, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গকৃত।

-আমি: দেখুন, যারা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে, তাদের সমস্ত কিছুর দায় দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাদের দেখেন। আপনি এদের চিন্তা মোটেও করবেন না।

-সাইফুল: মাননীয় এমাম, আমি কি আল্লাহর কাছে আরেকবার প্রাণ ভিক্ষা চাইব? আমি তো এত তাড়াতাড়ি যেতে চাই না। আমার বিশ্বাস আছে, বাড়িতে গেলে স্বাভাবিক খাবার খেলে আমি আবার কামব্যাক করতে পারি।

-আমি: না। আল্লাহর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন না। আল্লাহর কাছে চান, আল্লাহ, আমি তোমার সান্নিধ্য চাই, তোমার সন্তুষ্টি চাই। এই দেহ যদি আর আপনাকে ধারণ করতে না পারি তাহলে এই দেহ ত্যাগ করতেই হবে। আপনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ দেখছেন।

-সাইফুল: (আমার হাত শক্ত করে ধরে) আমি আপনার সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের মধ্যে থাকতে চাই।

এই কথা বলে তিনি সকল ভাইদের ডেকে আমার হাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। উনার ডাকে সবাই আমার হাত শক্ত করে ধরল। তিনি খুব অস্পষ্টস্বরে বলতে লাগলেন, ঐক্য নষ্ট করা যাবে না।

এর পর আমি উনার কপালে একটি চুমু দিয়ে বললাম, আল্লাহ হাফেজ! হাশরের দিন দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আমরা যারা এমামুযযামানের আত্মার সন্তান, আমরা সবাই একসাথেই থাকব। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা যেন আপনার এই অন্তিম চাওয়াকে পূর্ণ করতে পারি।

আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম যে সকাল বেলা হয়ত উনার জানাজা আমাকে পড়তে হবে এবং মেহেরপুরে উনার দেহ যাবে। কিন্তু প্রাণহীন দেহ। একজন মোজাহেদ এমামের প্রতি কতখানি সমর্পণ, কতখানি ভালোবাসা ধারণ করতে পারে, সাইফুল্লাহর শেষ আকুতি যারা দেখেছেন তারা অনুভব করতে পারবেন। সকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী ভূবনে যাত্রা করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আল্লাহ কাছে দোয়া করি, আল্লাহ! এই আনুগত্যশীল মোখলেস মোজাহেদকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মাকাম দান করো। আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দাও।

আমিন।

আখবারে তওহীদে লেখা পাঠানোর আবেদন

এবারের আখবারে তওহীদে যারা লেখা পাঠিয়েছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। স্থান সংকুলানের সীমাবদ্ধতার কারণে এবারের সংখ্যায় সবার লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত লেখাগুলো প্রকাশের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যারা আখবারে তওহীদ-এ নিজেদের লেখা প্রকাশ করতে আগ্রহী, তাদের নিচের মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে লেখা পাঠানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- বার্তা সম্পাদক

- Mail: **akhbaretawheed1995**@gmail.com
- WhatsApp: 01727-620046

শুভ বিবাহ

বর: মাসুদ বিন ইউসুফ
কনে: দিলারা খাতুন দীনা
বিবাহের তারিখ:
০১.১০.২০২৪
শাখা: উত্তরা, ঢাকা।

আখবারে তাওহীদের পক্ষ থেকে নবদম্পতির জন্য শুভকামনা ও অভিনন্দন

বর: মাসুদ রানা
কনে: নুসরাত জাহান নোভা
বিবাহের তারিখ:
০৯.১০.২০২৪
শাখা: উত্তরা, ঢাকা।

নতুন মুখ

নাম : তানভীরুল হক তানজিম
পিতা : ওবাইদুল হক
মাতা : সুলতানা রাজিয়া
জন্ম তারিখ : ২১ মে ২০২৫
জন্মস্থান: মিরপুর, ঢাকা।

“ আখবারে তওহীদের সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি মো. ওবাইদুল হক নবজাতকের পিতা। আমার সন্তানকে নিয়ে আমার কিছু কথা:

আমি বর্তমানে হেযবুত তওহীদের মিরপুর শাখার মডেল থানার আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে মিরপুর থেকে যখন হেজরত করে উত্তরায় গেলাম তার কিছুদিন পরেই জানতে পারি আমি তৃতীয় সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছি। খবরটি আমাকে খুবই আশ্চর্য করেছিল। কারণ দু'বছর আগে প্রথম সন্তানকে হারিয়ে আমরা গোটা পরিবারই প্রচণ্ড শোকে কাতর ছিলাম। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তৃতীয় একটি সন্তান চেয়ে বহুবার দোয়া করেছি। আল্লাহ যখন তা কবুল করেন আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই। আল্লাহর কাছে এ শুকরিয়া জানানোর ভাষা নেই।

আমি জানি হেযবুত তওহীদ হক সত্য। হেযবুত তওহীদের এমাম হক সত্য। হেযবুত তওহীদ দিয়েই সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাল্লাহ। যখন আমরা কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠিক সেই সময়েই আমার নবজাতক সন্তান পৃথিবীতে আগমন করলেন। জানি না দাজ্জালের এই দুঃসময়ে শিশুরা কতদিন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে! তবে হ্যা, খুব শিগ্রই এই দাজ্জালীয় সভ্যতার বিনাশ হবে ইনশাল্লাহ।

পরিশেষে, সবার সুস্থতা কামনা করছি। আমার নবজাতকের জন্য সবার নিকট দোয়া চাই। আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে নেক হায়াৎ দান করেন। সত্যনিষ্ঠ আন্দোলন হেযবুত তওহীদের একজন মর্দে মোজাহেদ এবং মাননীয় এমামের যোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেন। এই দোয়া কামনা সকলের কাছে। আল্লাহ কবুল করুক। আমিন।

নাম : আল নাজির ওয়াহিব
পিতা : এ.বি.এম রায়হান সরকার
মাতা : জায়েদা খাতুন
জন্ম তারিখ : ২১ মার্চ ২০২৫
জন্মস্থান: সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

“ নবজাতকের সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী। আল্লাহ যেন তাকে মর্দে মোজাহেদ হিসেবে আল্লাহর দীনের জন্য কবুল করেন। মাননীয় এমামের যোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেন। আখবারে তওহীদের মাধ্যমে সকল ভাইবোনদের কাছে দোয়া চাই। আমিন।

আপনার ঘরের সৌন্দর্য ও
টেকসই নির্মাণের বিশ্বস্ত ঠিকানা

মেসার্স রাসেল স্যানিটারি
এন্ড টাইলস কর্ণার

✓DBL Tiles-
আধুনিক ডিজাইন ও দৃষ্টিনন্দন টাইলস

✓Monalisa Tiles-
মানসম্মত, মজবুত এবং স্টাইলিশ

✓Lira PVC Pipe & Door-
টেকসই পাইপ ও দরজার নিশ্চয়তা

✓Gazi Pump & Tank-
সাশ্রয়ী দামে গাজী ব্র্যান্ডের নির্ভরযোগ্য পাম্প ও ট্যাংক

✓Marquis Pump-
উচ্চমানের পানি পাম্প

✓Bengal Door-
স্টাইল ও সুরক্ষার অনন্য সমন্বয়

ঠিকানা:
শঠিবাড়ী (খাদ্য গুদামের সামনে), মিঠাপুকুর, রংপুর
যোগাযোগ: ০১৭৫৬৪৯১৪৪২, ০১৭১৭০৪৮৭৯১

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে!

মানুষ সৃষ্টির কারণ

শান্তি কোন পথে?

লেখক: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশক: তওহীদ প্রকাশন

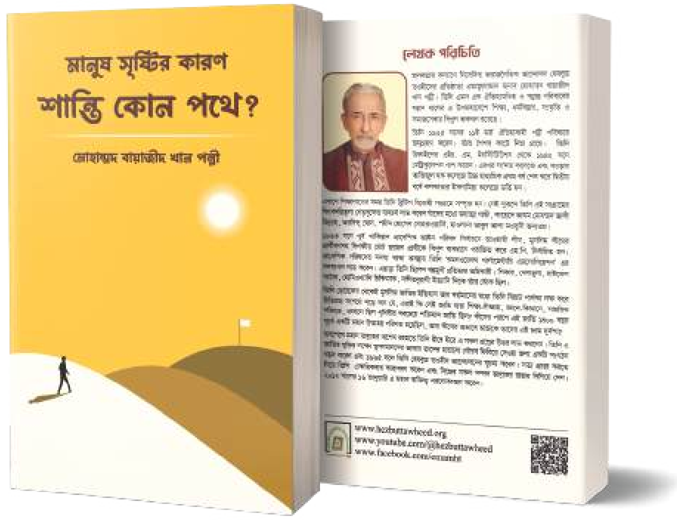

২০২৫ ঈদুল আজহার পত্রিকা বালাগ রিপোর্ট

ঢাকা বিভাগ	৮৪,২৫৯ পিস
খুলনা বিভাগ	৬৮,৯৪০ পিস
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫২,৩৯৭ পিস
ময়মনসিংহ বিভাগ	২২,৯৫৫ পিস
বরিশাল বিভাগ	২১,০২০ পিস
রংপুর বিভাগ	১৮,৮৫০ পিস
রাজশাহী বিভাগ	৯,৬৫০ পিস
সিলেট বিভাগ	৯,৩৫০ পিস

সম্পাদক: রিয়াদুল হাসান

নির্বাহী সম্পাদক: আদিবা ইসলাম

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: জোবায়ের হাসান

ইমেইল: akhbaretawheed1995@gmail.com

জুন ২০২৫

আখবারে তওহীদ

৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২০ (বিশ) টাকা মাত্র